
বঙ্গবাণী

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book. Vide T. B No. 76/7/TB/110 dated 24. 12 76

বঙ্গবাণী

সপ্তম শ্রেণী

শ্রীমতী রুবি চন্দ
ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল
পঃ দিনাজপুর

ডঃ নীরদবরণ হাজরা
লালগোপাল উঃ মাঃ বিদ্যালয় ও বকুলতলা
উঃ মাঃ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী
শিক্ষক, 'নবম-দশম' পত্রিকার সংযুক্ত
সম্পাদক কর্তৃক সংশোধিত

তড়িৎ প্রকাশনী
১৮ জে, টেমার লেন :: কলিকাতা-৭[illegible]

সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য : টাকা ৬·৫০

তড়িৎ প্রকাশনীর পক্ষে বি. মজুমদার কর্তৃক ১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও নিউ রূপলেখা প্রেস, ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

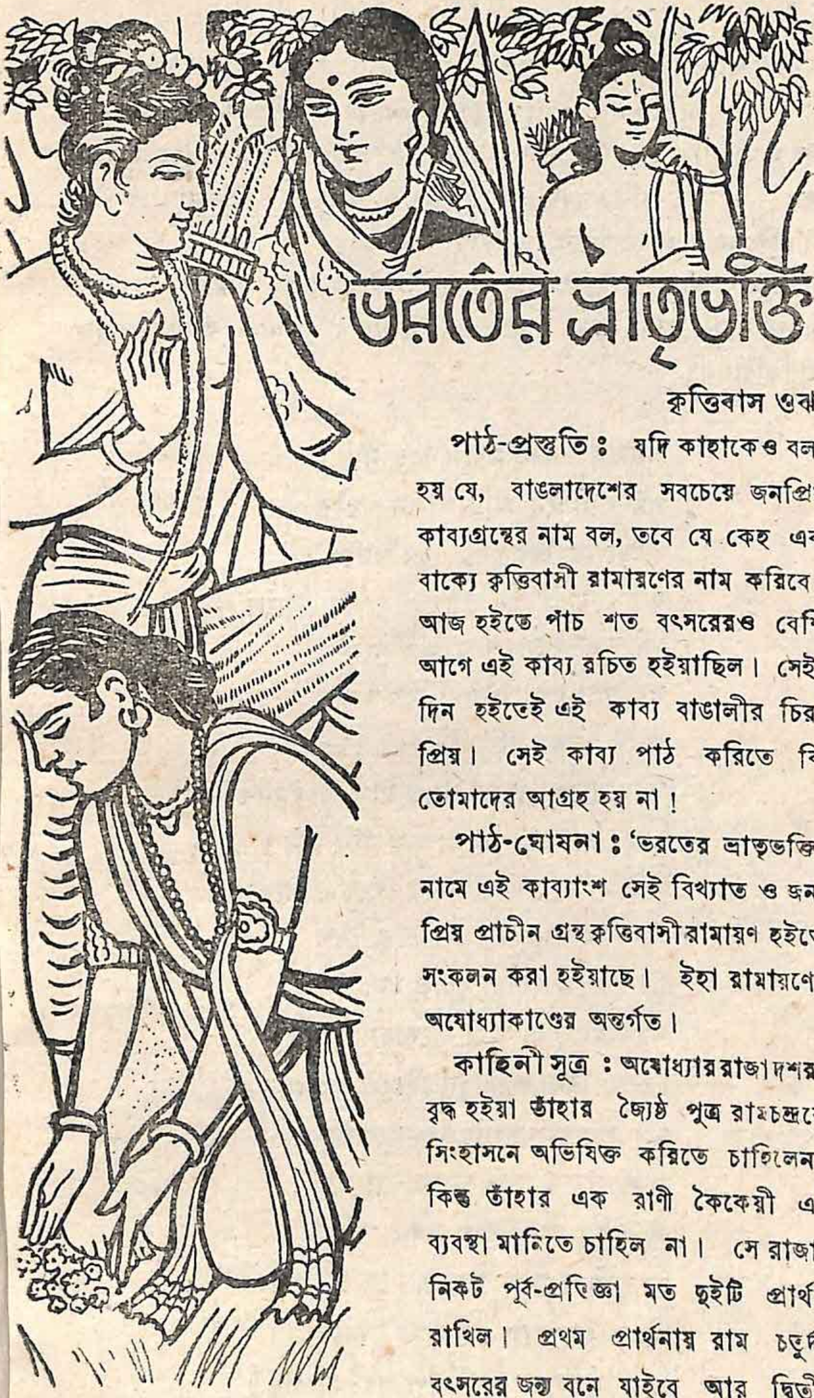
● পদ্যসূচী ●



● গদ্যসূচী ●

পরিশিষ্ট





ভরতের ভ্রাতৃভক্তি

কৃত্তিবাস ওঝা

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ যদি কাহাকেও বলা হয় যে, বাঙলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের নাম বল, তবে যে কেহ এক বাক্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের নাম করিবে। আজ হইতে পাঁচ শত বৎসরেরও বেশি আগে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। সেই-দিন হইতেই এই কাব্য বাঙালীর চির-প্রিয়। সেই কাব্য পাঠ করিতে কি তোমাদের আগ্রহ হয় না!

পাঠ-ঘোষনা ঃ 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' নামে এই কাব্যাংশ সেই বিখ্যাত ও জন-প্রিয় প্রাচীন গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে সংকলন করা হইয়াছে। ইহা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত।

কাহিনী সূত্র ঃ অযোধ্যার রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার এক রাণী কৈকেয়ী এই ব্যবস্থা মানিতে চাহিল না। সে রাজার নিকট পূর্ব-প্রতিজ্ঞা মত দুইটি প্রার্থনা রাখিল। প্রথম প্রার্থনায় রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইবে আর দ্বিতীয় প্রার্থনায় রাজ্য পাইবে তাহার পুত্র ভরত।

দশরথ এই প্রার্থনা পূরণ করিতে চাহিলেন না। কিন্তু রামচন্দ্র পিতার সত্য রক্ষার জন্য বনে চলিলেন। শোকে দশরথ দেহত্যাগ করিলেন। তখন ভরত ছিলেন মামা বাড়িতে। তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া সব শুনিয়া খুবই মর্মাহত হইলেন। বংশের রীতি লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাজা হইতে চাহেন না। অতএব তিনি চলিলেন তাঁহার দাদাকে ফিরাইয়া আনিতে।

চিত্রকূট পর্বতে রাম-ভরতের মিলন হইল। কিন্তু রামচন্দ্র কিছুতেই ফিরিলেন না। তখন ভরত রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার পাদুক লইয়া ফিরিলেন।

গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর।
পথ-পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর ॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে ॥
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন চরণবন্দন ॥
ভরত কহেন ধরি শ্রীরামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
বামা জাতি স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথায় গেছে দেশান্তরে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু, দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার ॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায় ॥

চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ ॥

জোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ, করি গিয়া রাজা।
তবে ত পারিব আমি, পালিবারে প্রজা ॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম, ঘরে।
ত্রিভুবনে ভয় মম নাহি কার তরে ॥
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক ॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলেন ভরত তবে রামের আজ্ঞায় ॥

আলোচনা ঃ কবিতাটিতে কবি সহজ-সরল ভাষায় প্রাচীন ভারতের দুই আদর্শ চরিত্র আঁকিয়াছেন। রাজ্য হাতে পাইয়াও ভরত আসিয়াছেন দাদাকে ফিরাইয়া লইতে, দাদা রাম বারংবার রাজ্য পাইয়াও পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছেন। স্বার্থ অপেক্ষাও সত্য ও আদর্শ তাঁহাদের নিকট বড়। এমন কি ভরত যখন তাঁহার মাতাকে দোষারোপ করিয়াছেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকেই তিরস্কার করিয়াছেন। মাতার নিন্দা তো পুত্রের মুখে শোভা পায় না।

এই আদর্শকে কি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না! আমরা কি সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী হইতে পারি না! সত্যের জন্য ঐশ্বর্য ও স্বার্থত্যাগই তো ভরতের আদর্শ ও নীতি।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন ঃ

১। ভরত কিভাবে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রতিদানে রামচন্দ্র কি কি করিলেন? ভরত কি বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শুরু করেন? প্রত্যুত্তরে রামচন্দ্র কি বলিলেন? [২+২+৩+৩]

২। 'সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।' এই কথা কে, কখন কাহাকে বলিলেন? তাঁহার মনঃক্লেশ কেন? যাহাকে অনুরোধ করা হয়, তিনি কি করিলেন? [৪+৩+৩]

৩। 'চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্য ভার।' প্রভু কে? কোথা হইতে অযোধ্যায় যাইবেন? এইরূপ অনুরোধ করিবার কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। [১+২+৭]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'পড়িলেন…চরণ কমলে।' কে, কাহার চরণে পড়িলেন? কেন? [২+১]

২। 'অপরাধ ক্ষমা কর।' কে, কাহার কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিলেন? [১+১+১]

৩। 'না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত'—কাহার, কোন কাজকে না বুঝিয়া বলা ভাবা হইয়াছে? কেন? [২+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥'

কাহার রচিত কোন্ রচনার অংশ? কাহার সম্পর্কে কে এই কথা বলিয়াছেন? অযোধ্যা কোথায়? তাঁহাকে অযোধ্যার সার বলা হইয়াছে কেন? দিবসে অন্ধকার কিরূপ? এমন বলিবার কারণ কি?

[২+২+১+১+১+১]

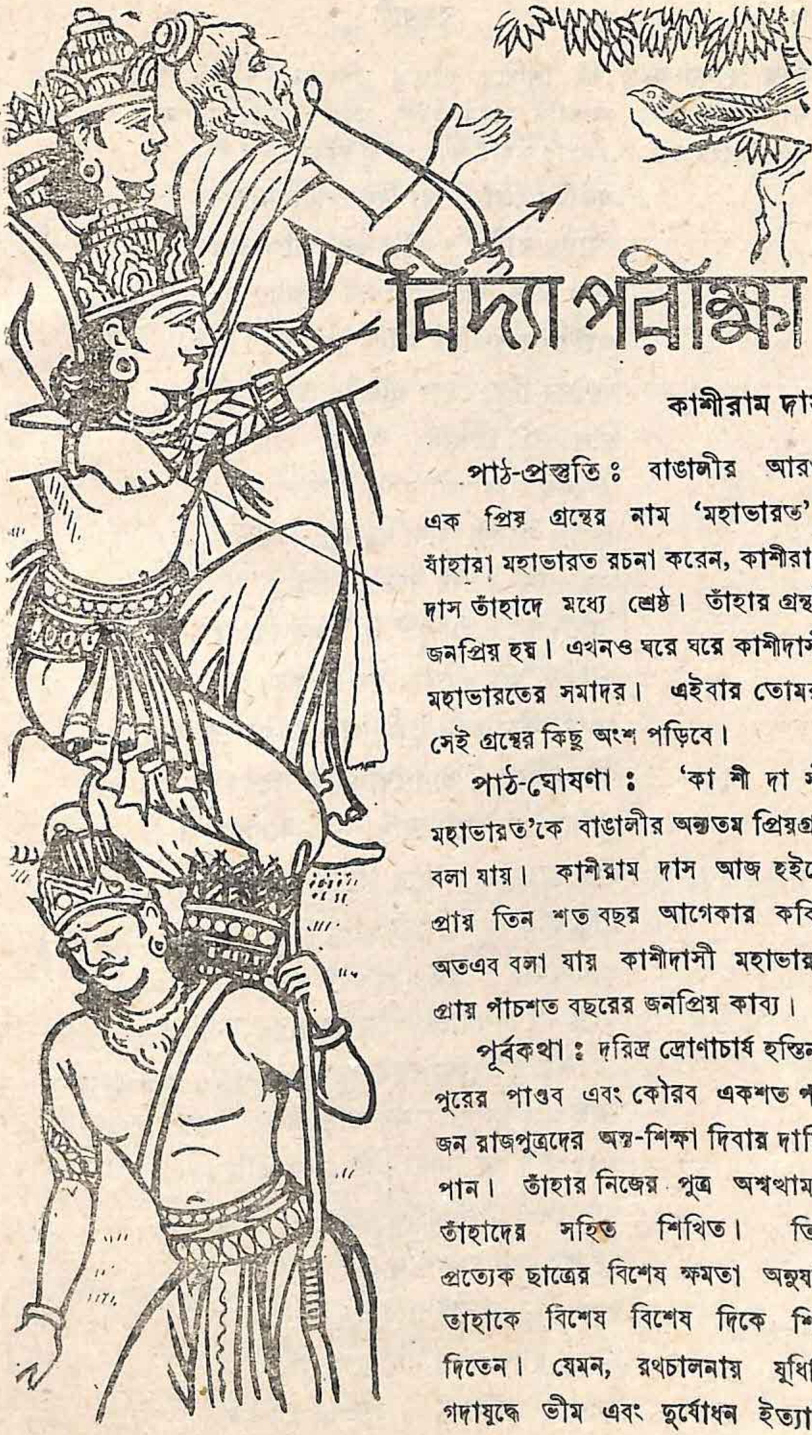
ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি ১ নম্বর)

১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য গঠন কর ঃ বায়া, দেশান্তর, অনুযোগ, নয়নে, নীর, পথ-পর্যটন, চরণ, দাসবৎ, সবিনয়ে, শিরে।

২। পদ পরিবর্তন কর ঃ শরীর, আনন্দ, বন, ভূষণ, অভিষেক।

৩। লিঙ্গান্তর কর ঃ প্রভু, পণ্ডিত, পিতা, রাজা।

Love and devotion to brother.
To forsake wealth or property for the sake of truth is the ideal of India.



বিদ্যা পরীক্ষা

কাশীরাম দাস

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ বাঙালীর আরও এক প্রিয় গ্রন্থের নাম 'মহাভারত'। যাঁহারা মহাভারত রচনা করেন, কাশীরাম দাস তাঁহাদে মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার গ্রন্থই জনপ্রিয় হয়। এখনও ঘরে ঘরে কাশীদাসী মহাভারতের সমাদর। এইবার তোমরা সেই গ্রন্থের কিছু অংশ পড়িবে।

পাঠ-ঘোষণা ঃ 'কা শী দা সী মহাভারত'কে বাঙালীর অন্যতম প্রিয়গ্রন্থ বলা যায়। কাশীরাম দাস আজ হইতে প্রায় তিন শত বছর আগেকার কবি। অতএব বলা যায় কাশীদাসী মহাভারত প্রায় পাঁচশত বছরের জনপ্রিয় কাব্য।

পূর্বকথা ঃ দরিদ্র দ্রোণাচার্য হস্তিনা-পুরের পাণ্ডব এবং কৌরব একশত পাঁচ জন রাজপুত্রদের অস্ত্র-শিক্ষা দিবার দায়িত্ব পান। তাঁহার নিজের পুত্র অশ্বত্থামাও তাঁহাদের সহিত শিখিত। তিনি প্রত্যেক ছাত্রের বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাকে বিশেষ বিশেষ দিকে শিক্ষা দিতেন। যেমন, রথচালনায় যুধিষ্ঠির, গদাযুদ্ধে ভীম এবং দুর্যোধন ইত্যাদি।

কিন্তু ধনুর্বিদ্যা সবাইকেই শিখিতে হইত। শিক্ষাত' হইল; কিন্তু পরীক্ষা না হইলে শিক্ষা কতখানি সার্থক হইল, তাহা বোঝা যায় না। এইখানে রাজপুত্রদের সেই পরীক্ষার কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন দ্রোণাচার্য্য বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেই ক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাস পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
ঐ দেখ ভাসপক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য ধর ধনুঃশর॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাস পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম্ম কহিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষ পরে।
তুমিতে তোমারে দেখি, আর সহোদরে॥
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই মত কহিলেন সব ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লইয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবা মাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা শির ধনুঃশর হানি॥

গুরু বাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণ থাকি, দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষ মধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষী শির।
না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থ বীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥

আলোচনা ঃ সেইকালের পরীক্ষা এবং বর্তমানকালের পরীক্ষা মনে মনে তুলনা কর। কোন্ পরীক্ষাকে তোমার উপযুক্ত মনে হয়? কেন?

অর্জুনের কথা হইতে কি অভিজ্ঞতা হইল তোমার? পৃথিবীর যে-কোন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে গেলে চাই একাগ্রতা। সব ভুলিয়া শুধু সেই টুকুতে মনোনিবেশ না করিলে সার্থক হওয়া যায় না। এই কবিতা হইতে যদি অর্জুনের নীতি গ্রহণ করিতে পার তবে কবিতা-পাঠ সার্থক হইবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন ঃ

১। দ্রোণাচার্য্য কে? তিনি কাহাদের অস্ত্র পরীক্ষা করেন? তিনি কি-ভাবে অস্ত্র পরীক্ষা গ্রহণ করেন? [২+২+৪]

২। দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য কুমারদের অস্ত্রপরীক্ষাস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন কেন? দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের প্রশংসা করিলেন কেন?

[৪+৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

'অর্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥'

কাহার রচিত, কোন্ রচনার অন্তর্গত? কেন অর্জুন এমন বলিলেন? এইরূপ বলার তাৎপর্য কি?

[২+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। অর্জুন কিভাবে লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে সফল হইলেন? [৩]

২। "না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থ-বীর।"

—'পার্থবীর' কে ছিলেন? তিনি কখন, কিভাবে পক্ষী-শির কাটিলেন?

[১+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

(প্রতিটি ১ নম্বর)

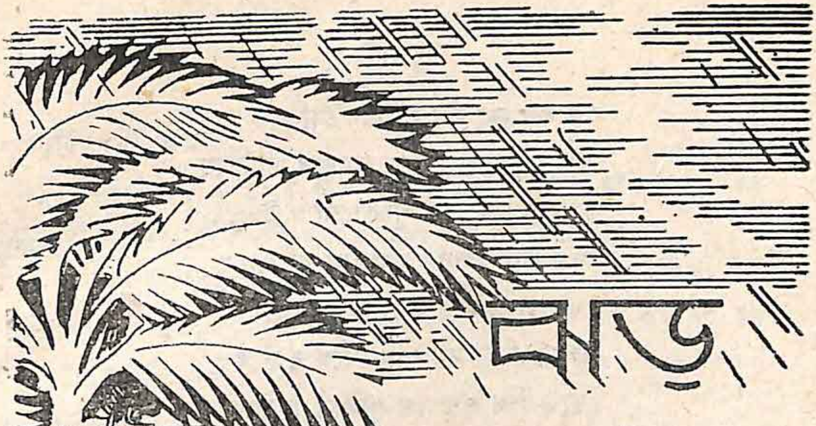
১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর ঃ ধনুঃশর, করে, পানে, সহোদর, বৃকোদর, নন্দন, বাণী, নয়নে, অঙ্গ, নিরীক্ষণ, মুণ্ড, শির।

২। শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ ঃ নিরখিয়া, নিন্দিয়া, পরীক্ষিতে, আলিঙ্গিয়া হরষিত।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

দ্রোণাচার্য্য — — মন।
— পুনঃ পুনঃ করেন —॥
— করেন দ্রোণ — অপার।
— চমৎকার হৈল সকল —॥

Attentiveness is the secret of success.



ঝড়



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পাঠ-প্রস্তুতি : এইবার আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি প্রকৃতিচিত্র পড়িতে চলিয়াছি। কবি ঝড়ের তাণ্ডবের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন, পড়িতে পড়িতে মনের মধ্যে কাল বৈশাখীর ঝড়ের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। কবি ছন্দে এবং ভাষা প্রয়োগে ঝড়ের গতিটাও যেন আমাদের মনে ধরিয়া দেন।

নিচের শব্দগুলির অর্থ জানিয়া লইয়া পড়িতে বস। তাহা হইলে কবিতাটির রসগ্রহণ সহজ হইবে। সমীরণ, ঘন, চপলা, দ্বিজ, ভেক, দলচয়।

মূলভাব : কবিতাটিতে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়ের একটি ভাষাচিত্র আঁকা হইয়াছে। ঝড় কবির মনে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু যেন চঞ্চল, প্রাণবন্ত—ক্রিয়াশীল। সকলেই যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

ঝন্ ঝন্ সন্ সন্ সমীরণ হাঁকিছে।
গুড়, গুড়, দুড়, দুড়, ঘনকুল ডাকিছে ॥
চপলার স্বর্ণহার আকাশেতে উড়িছে।
দ্বিজ সব কলরব ফুলবনে যুড়িছে ॥
হতবল তরুদল ধরাতল লুটিছে।
দলচয় স্থির নয় বায়ু বেগে ছুটিছে ॥
ছেড়ে পথ শূন্য রথ ধূলিচয় চড়িছে।
দুম দাম অবিরাম দ্বারে দ্বার পড়িছে ॥
এ কি ধূলি যেন তুলি পুনরায় আঁকিছে।
রেণু ধূম কুমকুম থাকে থাকে থাকিছে ॥
অকস্মাৎ বজ্রপাত দাঁতে দাঁত লাগিছে।
ঝন্ ঝন্ করে রণ যেন তোপ দাগিছে ॥
পড়ে জল অবিরল মুক্তাফল ঝরিছে।
তড় তড় তড় তড় কি যে রব করিছে ॥
সুখাকুল ভেককুল ঘোরনাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বরষার বাড়িছে ॥
একেবারে এক ধারে বজ্রবাড় ঝাড়িছে।
নীরদের মস্তকের চূড়া ভাঙ্গি পড়িছে ॥
হলো বৃষ্টি গেল রিষ্টি যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে ॥
কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের দেখি ফের রচনায় মেতেছে ॥

আলোচনা ঃ লক্ষ্য করিয়াছ কি, যে কবিতাটির প্রত্যেক চরণের শেষে একটি করিয়া ক্রিয়াপদ আছে। সব ক্রিয়াপদই ঘটমান বর্তমানকালের। এই ক্রিয়াপদ গড়িতে'-ইছে' এবং '-এছে' বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে।

কেন এত ক্রিয়াপদ বলত ? আসলে ঝড়েতো কাজের পর কাজ—এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই ঝড়ের গতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন ঃ

১। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাটি অনুসরণ করিয়া একটি ঝড়ের ছবি আঁক। এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, গাছ, মেঘ, ধূলি এবং কবিদের কথা বিশেষভাবে বল। [৮]

২। ঝড় কবিতার বিষয়বস্তু কি? কবির বর্ণনার বৈশিষ্ট্য কি? এই কবিতায় কবি এবং ভগবানের কথা কিভাবে আসিয়াছে? এই কথা বলা কি ঠিক হইয়াছে? [২+৩+২+১]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যেতেছে।"
—কিভাবে এবং কেন কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলিতেছে? [১+২]

২। "ত্রিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে ॥"—
ভগবানের মহিমা কিভাবে প্রকাশিত হইতেছে? [৩]

৩। ঘনদলের 'সখাকুল' কাহারা? তাহারা কি করে? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। "হলো বৃষ্টি……মহিমা প্রকাশিছে।"
উদ্ধৃতিটি কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? বৃষ্টি কি? তাহা কেন গেল? ইহাতে ত্রিলোকপালকের মহিমা কিরূপে প্রকাশিত হয়? [৩+১+২+২]

২। "চপলার স্বর্ণহার আকাশেতে উড়িছে।" কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? 'চপলা' কথাটির অর্থ কি? তাহার সোনার হার কিভাবে আকাশে উড়িতেছে? এই তুলনাটি ব্যাখ্যা কর। [২+১+২+৩]

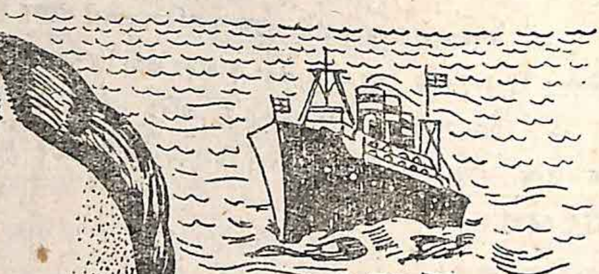
ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি ১ নম্বর)

১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর: সমীরণ, চপলা, দ্বিজ, অবিশ্রাম, রেণু, ভেককুল, নীরদ, ত্রিলোক।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

হলো — গেল — যেন — হাসিছে।
ত্রিলোকের — মহিমা প্রকাশিছে ॥
কবিদের — দ্বারা — যেতেছে।
স্বভাবের — ফের — মেতেছে ॥

A few pen pictures of natural scene of Bengal during the time of Storm





বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পাঠ-প্রস্তুতি : লক্ষ্য করিলে দেখিবে আগের কবিতা দুইটির সঙ্গে এই কবিতাটির রীতির মিল নাই। ঐ কবিতা দুইটির প্রতি চরণের শেষে দাড়ি ছিল। এইখানে নাই। গদ্যের মত এক লাইনের ভাব অন্য লাইনে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এক বিশেষ রীতির ছন্দ। ইহাকে বলে অমিত্রাক্ষর।

এই কবিতাটিতে মাত্র চৌদ্দ চরণ আছে। এই জাতীয় রচনার নাম সনেট —বাঙলায় বলে চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

মূলভাব : এক সময় মাইকেল মধুস্দন দত্ত ইংরাজী ভাষায় কাব্যচর্চা করিতেন। মহৎ কাব্য লিখিয়াও তিনি খ্যাতি পাইলেন না। তখন তিনি শুরু করেন বাঙলায় কাব্যচর্চা। এইবার পাইলেন সম্মান, পাইলেন খ্যাতি। সেই আত্মস্বীকৃতিই এই কবিতা।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরে ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

আলোচনা : কবিতাটি মধুসূদন দত্ত নিজ জীবনের কথা বলিয়াছেন। ইংরাজীতে কাব্য লিখিয়া সেকস্‌পীয়র-মিলটনের মত খ্যাত হইবেন, এই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। এইজন্ম তিনি কম ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ইংরাজী কাব্যও কম উৎকৃষ্ট নয়। তবুও ইংরাজ সমাজ তাঁহাকে যোগ্য কবিখ্যাতি দেয় নাই। তখন তিনি বাঙলায় কাব্য রচনা শুরু করেন এবং অচিরে যুগ-প্রবর্তক কবি-হিসাবে খ্যাত হন।

কবির জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিশাইয়া পড়িলে কবিতার তাৎপর্য বাড়িবে। 'মধুসূদন দত্তে'র চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর এটি তৃতীয় কবিতা।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। বঙ্গভাষা কবিতায় কবির মূল বক্তব্য কি? কবি কিভাবে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন?—কবির জীবনকথা হইতে এই বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।
[৪+৬]

২। 'স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে'—কুললক্ষ্মী কে ? আগে কি ঘটিয়াছিল ? পরে কুললক্ষ্মী কি বলিয়াছিলেন ? [২+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বঙ্গভাষা কবিতায় কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' আচরণের কথা বলিয়াছেন কেন ? কি কারণে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন ? [২+১]

২। 'এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?' কাহার ভিখারী দশা ? কাহাকে ভিখারী দশা বলা হইয়াছে ? [২+১]

৩। 'পালিলাম আজ্ঞা সুখে'—আজ্ঞাটি কি ? আজ্ঞা 'সুখে' পালিলাম বলিবার অর্থ কি ? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।'

আলোচ্য অংশ কাহার রচিত, কোন্ কবিতার অংশ ? পরধন কি ? করিনু ভ্রমণ বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? ভিক্ষাবৃত্তির তাৎপর্য কি ? কুক্ষণ কেন বলিয়াছেন ? [২+২+১+২+১]

২। 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল-কানন !'

আলোচ্য অংশ কাহার রচিত কোন্ কবিতার অংশ ? কাহাকে বিফল তপ বলা হইয়াছে ? 'অবরেণ্যে বরি' বলিতে কি বুঝ ? দ্বিতীয় পংক্তির তাৎপর্য বল। [২+২+২+৩]

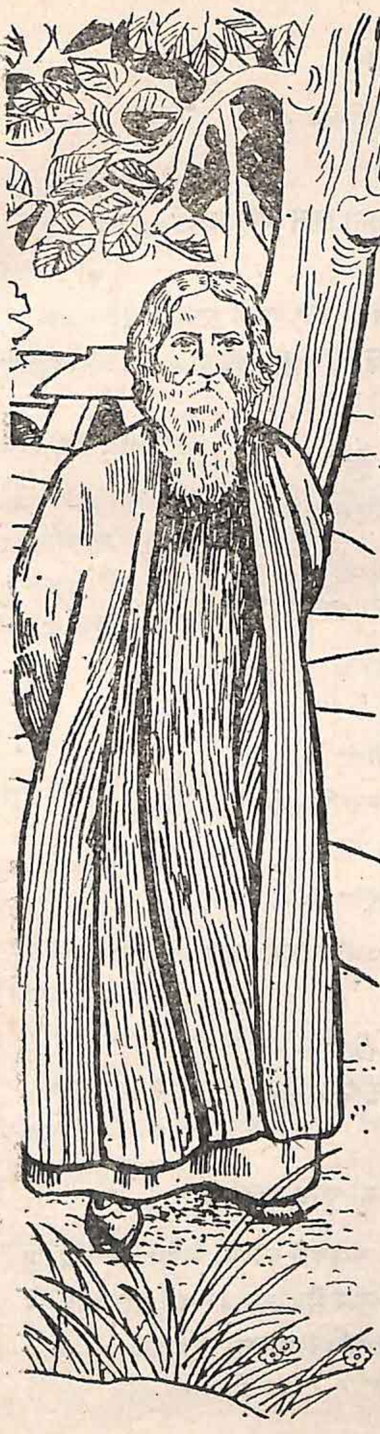
ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

(প্রতিটি ১ নম্বর)

১। গদ্যরূপ লিখ : করিনু, আচরি, কাটাইনু, মজিনু, বরি, ফেলিনু, ক'য়ে, দিলা, মোরে, ফিরি।

২। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর : ভাণ্ডারে, ভিক্ষাবৃত্তি, কায়মন, শৈবাল, কমল-কানন, রতন, খনি।

Eulogy to the glory of Bengali language.



প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ বিপদে পড়িলেই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ঃ রক্ষা কর। ইহা তো শিশুর মত আচরণ। ঈশ্বর রক্ষা করিলে আমার গৌরব কোথায়? কবি তাই বলেন, আমাকে শক্তি দাও—আমি যেন বিপদকে ভয় না করি। এই নতুন বক্তব্যের প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে এই কবিতায়।

ভাববস্তু ঃ কবি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিতে চাহেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করিয়া পদে পদে রক্ষা করিবেন, ইহা কবির আকাঙ্ক্ষা নয়। বরং ঈশ্বর তাঁহাকে এমন শক্তি দিন, যাহাতে তিনি সহজেই সব বিপদে আত্মশক্তিতেই উদ্ধার পাইতে পারেন। আর সর্ব সময়ে যেন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার মন ঈশ্বর-নিমগ্ন থাকে।

ঈশ্বরভক্তির মধ্যেও কবি আত্মশক্তির পূজারী। কবির মধ্যে নব মানবতাবাদ লক্ষণীয়।

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে-ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি,
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ,
এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি
না-ইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারই মুখ লইব চিনে--
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নোবেল পুরস্কার পান, সেই গ্রন্থের নাম গীতাঞ্জলি। এই কবিতাটি ঐ গ্রন্থের চতুর্থ কবিতা। কবিতার প্রার্থনার অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। ঈশ্বরের নিকট কবি কি কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? তাঁহার প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য কি ? [৪+৪]

২। কবি ঈশ্বরের নিকট সাহায্য না কহিয়া যাহা চাহিয়াছেন তাহা বল। সাধারণ লোকের প্রার্থনার সহিত তাঁহার প্রার্থনার পার্থক্য দেখাও। [৪+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'নাই বা দিলে সান্ত্বনা'—সান্ত্বনা না দিলে কি দিবেন ? কবির সান্ত্বনা না চাহিবার কারণ কি ? [১+২]

২। 'নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।' নিজের মনে ক্ষয় মানা অর্থ কি ? ক্ষয় না মানার কারণ কি ? [২+১]

৩। 'যেদিন করে বঞ্চনা।' কোন্ দিন কে, কাহাকে, কিরূপ বঞ্চনা করে ? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'বিপদে মোরে······না যেন করি ভয়।'

সাধারণ লোকের প্রার্থনা কি থাকে ? কবি ইহার পরিবর্তে কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? কবির এই প্রার্থনা কেন ? ইহার দ্বারা কি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে। [২+২+২+২]

২। 'নম্র শিরে সুখের দিনে······না করি সংশয়।'

সুখের দিনে সাধারণ মানুষ কি করে ? কবি কি করিতে চাহেন ? কেন ? দুঃখের রাতে কি হয় ? নিখিল ধরা বঞ্চনা করে, এই কথার অর্থ কি ? তোমারে সংশয় অর্থ কি ? [১+১+১+১+১+১]

(প্রতিটি ১ নম্বর)

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

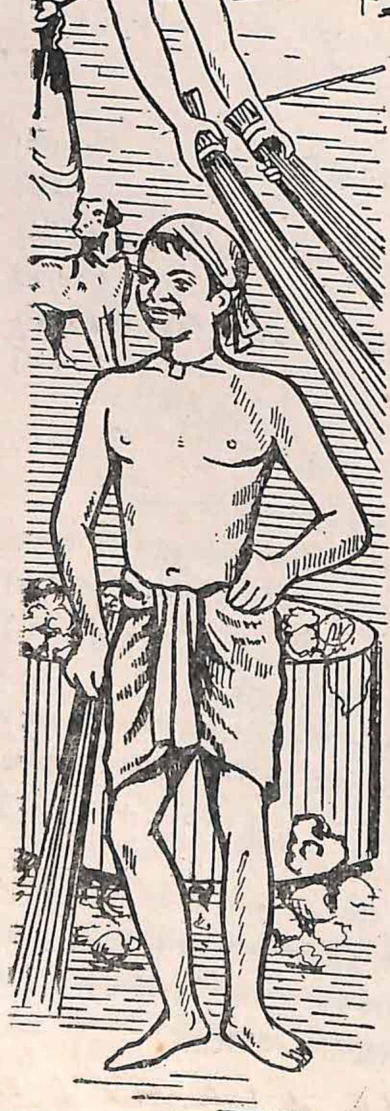
১। গদ্যরূপ বল : মোরে, চিত্তে, টুটে, শকতি, ত্বরিতে।

২। সমনাম শব্দ বল : শির, রাত।

৩। বাক্যে প্রয়োগ কর : ব্যথিত, লাঘব, সান্ত্বনা।

A 'prayer to stand up one's on he





মেথর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ 'অস্পৃশ্যতা' আমাদের সমাজের এক কলঙ্ক। আজ পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতার প্রভাব অনেক ম্লান। এইজন্য কবি-সাহিত্যিকদের কৃতিত্ব কম নয়। যাঁহারা অস্পৃশ্যতাবিরোধী কবিতা লিখিয়া লোকের মনকে আলোকিত করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাদের একজন। এই কবিতাটি এক সময় বাঙলাদেশের শিক্ষিত-জনের মুখে মুখে ঘুরিত।

ভাববস্তু ঃ আমরা সাধারণতঃ মেথরদের অস্পৃশ্য-অশুচি ভাবিয়া থাকি। তারা নোংরা পরিষ্কার করিয়া আমাদের পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে। তাহা হইলে তাহাকে অপবিত্র ভাবার অধিকার আছে কি! কবি ভাবিতেছেন, শিব যেমন বিষপান করিয়া পৃথিবীকে বিষমুক্ত করিয়াছেন, মেথররাও তেমনি নিজেকে অপবিত্রতায় নামাইয়া আমাদের পবিত্র রাখিয়াছে।

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পেছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি-দিন সর্ব ক্লেদ-গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল ;
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ ;
আর তুমি ! তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

আলোচনা ঃ ১. এইটিও একটি সনেট।

২ সনেটের মূলভাব সাধারণতঃ শেষ দুই পংক্তিতে থাকে। এইখানেও সেইরূপ শেষ দুই পংক্তিতে মূলভাব। কবি মেথরদের নিকট হইতে মানবসেবার ধর্ম শিক্ষা করিতে চান।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন ঃ

১। কাহার পশ্চাতে শুচিতা ফিরিতেছে ? মানুষের বনে যাইবার কথা বলা হইয়াছে কেন ? সে কোন বাণী একাই জানিয়াছে ? নীলকণ্ঠ কে ? কেন তাহার সেই নাম ? কে, কিভাবে পৃথিবীকে নির্মল করিতেছে ?

[১+২+২+১+২+২]

২। 'হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ যে বাণী'—বন্ধু কাহাকে বলা হইয়াছে ? কেন বন্ধু বলা হইল ? সে কি বাণী জানিয়াছে ? একা জানিয়াছে কিরূপে ? তাহার নিকট কবির কি প্রার্থনা ?

[১+২+২+২+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি'—এইকথা বলার তাৎপর্য বুঝাও। [৩]

২। 'শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে'—কে, কাহাকে শিশু ভাবে? কিভাবে বুঝা যায়?

৩। 'নীলকণ্ঠ' সম্পর্কে টীকা লেখ। [৩]

৪। নীলকণ্ঠের সঙ্গে মেথরকে তুলনা করা হইয়াছে কেন? [৩]

৫। মেথর কবিতাটির মূলভাব সংক্ষেপে বল। [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।'

কাহার রচিত কোন্ কবিতার অংশ? তুমি কে? তাহার সহিত গৃহবাসে রুচি থাকিবার সম্পর্ক কি? মানুষকে বনেই বা যাইতে হইত কেন? [২+১+৩+২]

২। 'নির্বিকার সদাশুচি তুমি গঙ্গাজল';

কাহার রচিত কোন্ কবিতার অংশ? গঙ্গাজল সম্পর্কে সাধারণ হিন্দুদের ধারণা কি? তুমি কে? তাহাকে কোন্ কোন্ দিক হইতে গঙ্গাজলের সহিত তুলনা করা যায়? তুলনা সার্থক কি? [২+২+১+২+১]

৩। 'এসো বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।'

কবি কাহাকে বন্ধু বলিয়াছেন? তাহাকে বন্ধু ও বীর বলিয়াছেন কেন? কোন্ শক্তি চান? দ্বিতীয় চরণের অর্থ বুঝাও। [১+২+১+৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

(প্রতিটি ১ নম্বর)

১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর: অস্পৃশ্য, রুচি, ক্লেদ, বাণী, নির্বিচারে, পৃথ্বী, নির্বিষ, নির্মল, চিতে, নীলকণ্ঠ।

২। লিঙ্গান্তর কর: বন্ধু, মানব, অস্পৃশ্য।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: শুচিতা, অস্পৃশ্য, নির্মল।

৪। পদান্তর কর: সেবা, শুচি, লাঞ্ছনা।

Contribution of a so called un-touchable — a friend of the society—



অভিযান



নজরুল ইসলাম

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজদের ভয়ে অত্যাচারে এক সময় ভারতবর্ষের মানুষেরা যেন মনে মনে মরিয়াছিল। কবিদের মন্ত্রেই তাহারা আবার বাঁচিয়া উঠে। এই জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "তুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।" এমনই এক প্রাণসঞ্চার-করা কবিতা নজরুলের 'অভিযান'।

ভাববস্তু ঃ কবি এই কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের দেশপ্রেমিকদের আহ্বান করিয়াছেন। তখন আর সকলেই ভয়ে পিছাইয়া আছে। স্বাধীনতার সৈনিকের হাতে অস্ত্র নাই। বিভেদপন্থীরা আত্মহনন করিয়া চলিয়াছে। তবু তাহার মধ্যেই আগাইয়া চলিতে হইবে স্বাধীনতার সৈনিককে। স্বাধীনতার স্বর্গে তাহাকে পৌছাইতে হইবে।

নতুন পথের যাত্রা পথিক! চালাও অভিযান
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—"মানুষ মহীয়ান।"
চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেল্‌বি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চল্‌বি মাতাল স্বর্গে দিবি টান।

সমর সাজের নাই রে সময় বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণসজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে গাইবে পাখী গান।
আয় বেরিয়ে সেই প্রভাতে ধরবি যারা তান।

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী যাত্রা পথিক সব,
এ উহারে হান্‌ছে আঘাত কর্‌ছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল, গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি "জয় নব উত্থান"।

আলোচনা: কবিতাটি চারমাত্রায় ছড়ার ছন্দে লেখা। ইহাতে কুচকাওয়াজের তাল মিলাইয়া চলার মত একটা গতি আছে। ইংরাজীতে এই জাতীয় কবিতাকে কুচকাওয়াজের কবিতা বা 'মার্চিং পোয়েম' বলে। কবিতাটি মুখস্থ ও আবৃত্তি করিবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন:

১। 'অভিযান' কবিতায় কবি কাহার জয়গান করিতেছেন? কবি কাহাদিগকে কোন্ খেলায় যোগদান করিতে বলিতেছেন? অভিযানে কিসের

পরশ প্রয়োজন ? কে, কাহাকে আঘাত হানিতেছে ? কবি কিসের মাদল বাজাইতে বলিতেছেন ? উষার দ্বারে পৌছিয়া তাহারা কি গাহিবে ?
[১+২+১+২+২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। চারিদিকে আজ কিসের মেলা ? কিভাবে বোঝা যায় ? [১+২]

২। যাত্রীদের আত্মঘাতী বলিয়াছেন কেন ? আঁধার ঘোরই বা কি ? [১+২]

৩। 'সেই আশায়ই রইলি সবে !' কোন্ আশায় রইল ? কেন ? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেল্‌বি কে আয় নতুন খেলা ?'

কাহার রচিত কোন্ কবিতার অংশ ? ভীরুর মেলা কেন ? নতুন খেলা কি ? কবি কাহাদের আহ্বান করিয়াছেন ? [২+৩+৩]

২। 'সমর সাজের নাইরে সময় বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব নাঙ্গা আদুর গায়।'

কাহার রচিত কোন্ কবিতার অংশ ? 'সমর সাজ' কি ? তাহার সময় নাই কেন ? বিপদ কি ? নাঙ্গা গায়ে পরশ লইবার তাৎপর্য কি ?
[২+১+২+১+২]

৩। 'আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী যাত্রাপথিক সব,
এ উহারে হান্‌ছে আঘাত করছে কলরব।'

'আঁধার ঘোর' কেন ? যাত্রাপথিক কারা ? আত্মঘাতী কেন ? 'এ উহারে হান্‌ছে আঘাত' কি ? কলরবই বা কি ? [১+১+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন : (প্রতিটি ১ নম্বর)

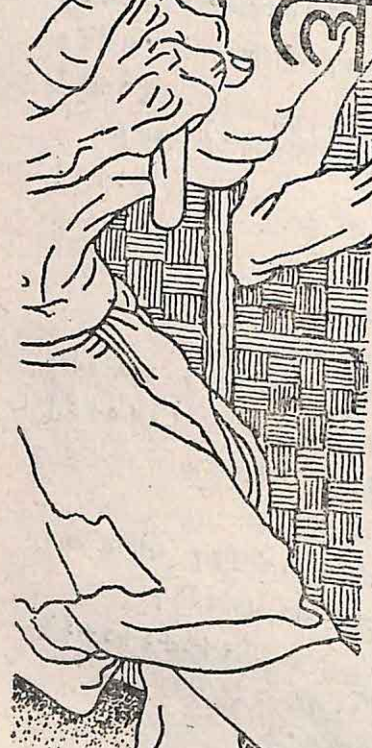
১। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর : উচ্চকণ্ঠে, মহীয়ান, নাঙ্গা, আদুল, আত্মঘাতি।

২। গদ্যরূপ বল : উচ্চার, সবে।

No hurdle can stand up in the way of those who struggle for independence.



লোহার ব্যথা



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ তোমরা হয়ত' লক্ষ্য করিয়াছ, আধুনিক কবিরা ক্রমেই সমাজ জীবনের দুঃখ-ব্যথা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। সাধারণ মানুষকে শোষণ করিয়াছে ফন্দিবাজের দল। কবিরা তাহাদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথও এই মানসিকতার কবি। 'লোহার ব্যথা' কবিতায় কবির সেই মন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাববস্তু ঃ কর্মকার লোহাকে পুড়াইয়া পিটাইয়া নানারকম আকার দেয়, তৈরি করে নানা অস্ত্র। ইহাতে কর্মকারের লাভ হয়। অর্থ উপার্জন করে সে। কিন্তু লোহার কি লাভ ? অথচ তাহারই স্বার্থে দিনরাত জ্বলিতেছে আগুন, হাতুড়ি, হাঁপর খাটিতেছে অবিরাম। ক্লান্ত সবাই। লক্ষ্য কর, এইখানে কর্মকার হইল ধনীর প্রতীক আর লোহা শোষিতের।

ও ভাই কর্মকার,
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধরেছো হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হলো,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা-ঠাঁই-ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে,
দেখ গো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, কর গো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।
রাত্রি দু'পরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা ক'রে;
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবি সম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
ধড় হ'তে কভু, বাহুল্য বোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্তন আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হ'য়ে যাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।
আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায় হোক্ না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি, ভাই হ'য়ে ভায়ে পেটে!
ও ভাই কর্মকার,
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম কর্মভার—
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেতো কিনা তোমার দিনের রুজি?

তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি !

আলোচনা : লোহাকে কবি সজীববস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মকার নিজের লাভ-লোকসানের কথাই ভাবে। লোহার দুঃখ-ব্যথা তাহার চিন্তায় নাই। সমাজে সাধারণ মানুষও এমন অবহেলিত। কবি লোহার নাম করিয়া তাহাদের কাছেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহাদের আঘাত করিয়া কি তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ ?

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। লোহা কর্মকারকে যে কথাগুলি বলিয়াছে, তাহা নিজের ভাষায় বল। কবিতাটির মূল অর্থ কি ? [৬+৪]

২। কর্মকারের হাপর কি করিতেছে ? লোহা পিটাইয়া কর্মকার লোহার কি কি আকৃতি তৈয়ারি করে ? লোহা কখন নিরুপায় হইয়া পড়ে ? কর্মকারের দিনের রুজি সম্বন্ধে লোহা কি বলিতেছে ? কৃতজ্ঞতা কথাটির অর্থ কি ? কেন কৃতজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে ? [২+২+১+২+১+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কর্মকারের ব্যবহারের যে অস্ত্রগুলির নাম লোহার ব্যথা কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম বল। কোন যন্ত্রে কি কাজ হয় ? [৩]

২। কর্মকারের কাজ কখন হইতে কখন পর্যন্ত চলে ? তাহার কাহার উপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ? [১+১+১]

৩। 'শান, পান, পোড়' বলিতে কি বোঝ ? [৩]

৪। 'যাহা অন্যায় হোক না প্রকাশ করিয়াছি প্রতিবাদ'—কে, কিভাবে কাহার প্রতিবাদ করিয়াছে ? [১+১+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'যাহা অন্যায় হোক্ না প্রবল করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ ?'

কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? কে প্রতিবাদ করিয়াছে? কে প্রবল? তাহা অন্যায় কেন? খাদ কি? তাহাকে কোমল অংশ বলিবার অর্থ কি? [২+২+১+১+১+১]

২। 'তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি!'

তুমি কে? আমিই বা কে? কেন ক্ষতি হইত না? কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কেন আসিল? 'হাতুড়ির মারফতি' কথাটির মধ্যে যে ব্যঙ্গ আছে, তাহা বুঝাইয়া বল।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি ১ নম্বর)

১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ ঝিল্লীমুখর, নেহাই, আতঙ্ক, শীতল, দাহ, প্রতিবাদ, বাহুল্যবোধ, খাদ, রুজি, মারফত।

২। গদ্যরূপ লিখ ঃ মম, হ'তে, নারি, তাহে।

৩। সমনাম শব্দ লিখ ঃ রাত্রি, সলিল, মাথা, হস্ত, দিন।

৪। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ ক্লান্ত, শীতল, সুখ, কোমল।

৫। পদান্তরিত কর ঃ গভীর, শিথিল, উজ্জ্বল, বাহুল্য।

A metaphorical poem. The poem describes how the rich earns money at the cost of services of the labourers.



উদ্যানে



কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ আগে তোমরা ঝড় নামে একটি প্রকৃতি কবিতা পড়িয়াছ। উহাতে ঝড়েরই বর্ণনা। আধুনিক কবিরা প্রকৃতিকে প্রথম বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিলেন না। প্রকৃতির মধ্যে জীবনের রূপ দেখিলেন। কবিকুল ভবিষ্যতের ফলের সম্ভাবনা বংশরক্ষায় সহায়ক। নতুন চিন্তা আসিল।

ভাববস্তু ঃ ফুল দেখিয়া কবির মনে অনেকগুলি নতুন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। রূপের মূল্য জানিয়াছেন কবি। রাগ শুধু চোখকে তৃপ্ত করায় নয়, প্রাণকেও পূর্ণ করিয়া দেয়। আবার ফুলও শুধু ফুল নয়, উহার মাঝেই বীজ লুকাইয়া আছে। বীজ হইতে হইবে ভবিষ্যতের বংশধারা রক্ষা। সৃষ্টি রক্ষার সেই আনন্দেই জাগিয়া উঠিয়াছে এত সৌন্দর্য।

চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
আজকে আমায় জানিয়ে দিলে রূপ যে কেমন মিষ্টি।
লাবণ্য আজ উথলে উঠে ধরতে নারে পত্র-পুটে,
চতুর্দিকে হয় যে প্রাণে সুধার ধারা বৃষ্টি॥
ভবিষ্যতের আনন্দ ওই ঘুমায় রূপের অঙ্কে,
বংশধরের জনম যেন জানায় অযুত শঙ্খে।
উঠল আজি আদিম রবি
লোহিত জবার আলোক ছবি
আশায় ভরা ত্বরায় হবে নূতন ধরার সৃষ্টি॥

আলোচনা : লক্ষ্য কর, কবির কাব্য-ভাবনায় বিজ্ঞানের প্রভাব পড়িয়াছে। ফুল যে তাহার বংশরক্ষা ও বংশবিস্তারের সহায়, তাহা কবির চিন্তায় ছায়া ফেলিয়া গিয়াছে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। কোথায় ফুল ফুটিয়াছে? তাহাদের রূপ কেমন? অযুত শঙ্খে কি জানাইতেছে? রবির ছবি কেমন? কাহার সহিত রবির তুলনা করা হইয়াছে? জীবনের উজ্জ্বল রবি কাহারা? [১+১+২+১+১+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কে কবিকে জানাইল যে রূপ মিষ্টি? কি রূপ জানাইল? [১+২]

২। 'নতুন ধরার সৃষ্টি' কিভাবে হইবে? [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'লাবণ্য আজ উথলে উঠে ধরতে পারে পত্র-পুটে,
চতুর্দিকে হয় যে প্রাণে সুধার ধারা বৃষ্টি।'

কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? কি কারণে লাবণ্য উথলাইয়া উঠিয়াছে? পত্র-পুটে ধরিতে পারে নাই কেন? সুধার ধারা কি? তাহা বর্ষণ হইতেছে কেন? [২+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন : (প্রতিটি ১ নম্বর)

১। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর : চৌদিকে, পত্র-পুট, অযুত, লোহিত।

২। পদান্তরিত কর : আনন্দ, লাবণ্য।

A flower is not only an object of beauty but it is the symbol of future creation.



সবার আমি ছাত্র



স্থনির্মল বসু

পাঠ-প্রস্তুতি ঃ মানুষের শিক্ষার নাকি অন্ত নাই—শিক্ষার স্থানেরও নাকি শেষ নাই। সকল সময়ে সকলের নিকট হইতেই নাকি শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। আলোচ্য কবিতাটি কবি সেই কথাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভাববস্তু ঃ আকাশের কাছ হইতেই উদারতা, বায়ুর কাছে কর্মী মন্ত্র, পর্বত মৌনতা, মাঠ উদারতা, সূর্য তেজদীপ্তি, চাঁদ মধুরতা, সাগর রত্ন-গর্ভতা, নদী প্রবাহমানতা, মাটি সহিষ্ণুতা, পাষাণ কর্মে কঠোরতা, ঝরণা সহজ গীতিময়তা, অরণ্য দিল সরলতা—শিক্ষা দিয়াছে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে তাকাইয়া কবি এই সব আদর্শ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই রে ;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায়—তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান্
খোলা মাঠের উপদেশে দিল্ খোলা হই তাই রে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়—আপন তেজে জ্বল্‌তে
চাঁদ শিখালো—হাস্‌তে মেদুর, মধুর কথা বল্‌তে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর অন্তর হোক রত্ন-আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম—আপন বেগে চল্‌তে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝর্‌ণা তাহার সহজ গানেই, গান জাগালো আমার প্রাণেই,
শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর্, সবার আমি ছাত্র,
নানান্ ভাবের নতুন জিনিস, শিখ্‌ছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়, পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখ্‌ছি সে সব কৌতূহলে, নেই দ্বিধা লেশ মাত্র।

আলোচনা : পৃথিবীর দিকে দিকে শিক্ষার বিষয় ছড়িয়ে আছে। এইসব উদাহরণ হইতে শিখিলে সমুন্নত দৃঢ় চরিত্র এবং কোমল মনের অধিকারী হওয়া যায়। শিক্ষাবিদেরা পুঁথিপড়াকে প্রয়োজনের পাঠ এবং বাহির হইতে শিক্ষাকে স্বাধীন পাঠ বলেন। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন পাঠ গ্রহণ না করিলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না।

॥ **অনুশীলনী** ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন ঃ

১। এই বিশ্বের আকাশ, বায়ু, পাহাড় ও মাঠের নিকট হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই? সূর্য, চাঁদ, সাগর ও নদী কি শিক্ষা দেয়? মাটি, পাষাণ, ঝর্ণা ও বনের নিকট কি শিক্ষা আমরা পাই? [৪+৪+২]

২। 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর'—পাঠশালা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কি? বিশ্বজোড়া পাঠশালা বলিতে কি বুঝ? এইখানে কাহার কাছ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে? [২+৩+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কাহার নিকট হইতে দিলখোলা হইবার শিক্ষা পাওয়া যায়? আকাশ এবং বায়ু কি শিক্ষা দিল? [১+২]

২। নদী এবং সাগরের নিকট হইতে কি কি শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে? [৩]

৩। পৃথিবীকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন? 'নেই দ্বিধা লেশমাত্র'—কি ব্যাপারে দ্বিধা নাই? [২+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'মাটির কাছে সহিষ্ণুতা........পাষাণ দিল দীক্ষা।'

আলোচ্য অংশ কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? মাটি কিরূপে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়? কঠোর হওয়া কোথায় প্রয়োজন, কেন? পাষাণ কিরূপে কঠোরতার শিক্ষা দেয়? [২+২+২+২]

২। 'এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়......নেই দ্বিধা লেশ মাত্র।'

কাহার রচিত কোন কবিতার অংশ? পৃথিবীকে খাতা ভাবিবার কারণ কি? পাঠ্য কি? শিখিবার সঙ্গে কৌতূহলের সম্পর্ক কি? দ্বিধালেশ নাই কেন? [২+২+১+২+১]

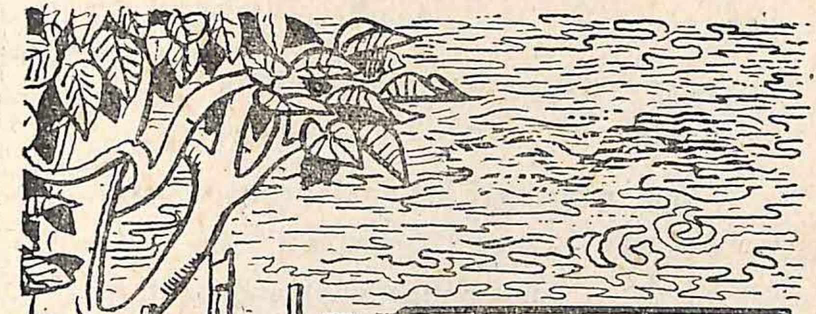
ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

(প্রতিটি ১ নম্বর)

১। শব্দার্থ লিখ: মৌন, মেদুর, অন্তর, সহিষ্ণুতা, বনানী, বিশ্বজোড়া, দিবারাত্র, কৌতূহল, দীক্ষা।

২। পদ পরিবর্তন কর: উদার, পাহাড়, মৌন, মধুর, শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সরসতা, বিরাট।

Nature is the best teacher.



মেঘনা



হুমায়ুন কবীর

পাঠ-প্রস্তুতি : একটি বিখ্যাত ইংরাজী কবিতার ছায়া লইয়া এই কবিতাটি লেখা হইয়াছে। কবিতাটির মধ্যে এক কর্মব্যস্ত মায়ের ব্যাকুল প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কন্যা আমিনাকে পাঠাইয়াছিলেন তাড়াতাড়ি মাঠ হইতে গরুগুলি ডাকিয়া আনিতে। কিন্তু তাহার এত দেরী কেন? তবে কি……। পড় কবিতাটি।

শোন্ মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল্ ;—
এল মেঘনায় জোয়ারের বেলা, এখনি নামিবে ঢল।
নদীর কিনারা ঘন ঘাসে ভরা,
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা,

করিস না দেরী—আসিয়া পড়িবে সহসা অথৈ জল।
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা, মেঘনায় নামে ঢল।

এখনো যে মেয়ে আসে নাই ফিরে—দুপুর যে বয়ে যায়!
ভরা জোয়ারের মেঘনার জল কূলে কূলে উছলায়।
নদীর কিনার জলে একাকার,
যে দিকে তাকাই অথৈ পাথার,
দেখতো গোয়ালে গোরুগুলি রেখে গিয়েছে কি ও-পাড়ায়।
এখনো সে কি রে আসে নাই ফিরে? দুপুরবেলা যে যায়।

ভর্ বেলা গেল, ভাটা পড়ে আসে, আঁধার জমিছে আসি;
এখনো তবুও এল না ফিরিয়া আমিনা সর্বনাশী।
দেখ্ দেখ্ দূরে মাঝ দরিয়ায়
কালো চুল যেন ঐ দেখা যায়।
কাহার শাড়ীর আঁচল আভাস সহসা উঠিছে ভাসি?
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী?

আলোচনা: মেঘনা নদী আজ বাংলাদেশে। ঐ নদীতে জোয়ার-ভাঁটা আসে যায়। জল বাড়ে-কমে। মা আমিনাকে জোয়ারের আগে মাঠে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমিনা ফিরিবার আগেই জোয়ার আসিল। ভাসাইয়া লইয়া চলিল আমিনাকে।

কবিতাটি করুণরসের।

॥ **অনুশীলনী** ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন:

১। মেঘনার তীর কেমন? এই তীরকে মেঘনা-তীরবাসীরা কিভাবে কাজে লাগায়? কি সতর্কতা থাকা উচিত? অসতর্কতায় কিরূপ বিপদ আসে? [২+২+৩+৩]

২। আমিনাকে কোথায় পাঠান হইয়াছিল? মা আমিনাকে বার বার কখন খোঁজ করেন? তাঁহার মনে কি কি সন্দেহ দেখা দেয়? কয়েকবার আমিনাকে শেষে মেঘনাকে কেন সর্বনাশী বলা হইয়াছে? [২+২+৩+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কে মাঠ হইতে গরু আনিবে? ত্বরা করিবার প্রয়োজন কি? ত্বরা না করিলে ক্ষতি কি? [১+১+১]

২। জোয়ার আসিবার আগে ও পরে মেঘনার রূপ বর্ণনা কর। [৩]

৩। 'এখনো সে ফিরে আসে নাই ফিরে?' কে ফিরিয়া আসে নাই? আসিয়া সে আর কোথাও যাইতে পারে কি? [১+২]

৪। টীকা লিখ: জোয়ার, ভাটা, মেঘনা।

A vivid description of how a peasant girl dies in the flooded water of the Meghna.



আমার পিতামহ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাঠ-প্রস্তুতি : ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলেই জানে বিদ্যাসাগর নামে। দরিদ্র ঘরে জন্মিয়া মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি গোটা দেশের সকলের প্রণম্য মানুষ হইল। আমাদের জীবনের কত দিকেই না তাঁহার অবদান ছড়াইয়া আছে। বাঙলা গদ্য সাহিত্যেরও আদি শিল্পী বলা হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। তোমরা সেই আদি শিল্পীর জীবনকথার খানিকটা তাঁহার ভাষাতেই পড়িবে। এখানে তিনি মূলতঃ তাঁহার ঠাকুরদার কথা বলিয়াছেন।

মনে রাখিও : বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদার মধ্যে যে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিতেছ, তাহা বিদ্যাসাগরের মধ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছিল।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে ; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না ; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্ম-সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল ; তাহারও, আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" জন্ম-সময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী

ছিলেন ; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা ও আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন কালেও আবশ্যক হয় নাই।

তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না ; তিনি স্পষ্টবাক্য বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন ; আপন ইষ্ট-সাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য না করিতে পারিতেন, এমন কর্মই নাই। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে এমন নির্বোধের কার্য করিতেন যে, তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও

বিবেচনা আছে এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্বদা, সর্বসমক্ষে, মুক্ত কণ্ঠে বলিতেন, এগ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলেই গরু। একদিন তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মল-ত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়, ওস্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি? সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ, স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্টকথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারো ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোন কারণে, তিনি, কখনও কোন বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে; কিন্তু, তদীয় আচারে, আলাপে, বা কার্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্টচিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোন বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী

হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া, নির্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটির বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থান দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ-সংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার

পাইলেন বটে ; কিন্তু তৎকৃত ক্ষতদ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারিক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুর পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

আলোচনা : লক্ষ্য করিবে যে, লেখক নিজেকে লইয়া কিরূপ রসিকতা ও হাস্য পরিহাস করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন তাহা ছাড়িতেন না। তাঁহার গোঁ ছিল এঁড়ে গরুর মতই।

এই গুণটি তাঁহার ঠাকুরদার মধ্যেও ছিল। ঠাকুরদা ছিলেন যেমন তেজস্বী তেমন দৃঢ় চরিত্রের লোক। ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিয়া রামজয়ের চরিত্র সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। 'তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন, তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে।'—কাহার কথা বলা হইয়াছে ? পরিহাস বাক্যটি কি ? ঘটনাটি বল ? কে, কিভাবে বিফল হয় নাই ? [১+২+৩+৪]

২। একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়া দেখাও যে, রামজয় তর্কভূষণ যেমন বলবান তেমন সাহসী ছিলেন। তাঁহার রসিকতার পরিচয় দাও। [৬+৫]

৩। রামজয় তর্কভূষণের চরিত্র বর্ণনা কর। [১০]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। "আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।"—কথাটি কে, কাহাকে, কখন বলিলেন ? এঁড়ে বাছুর বলিতে এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে ? [২+১]

২। কত বৎসর বয়সে কিভাবে রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যু হয় ? রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ কে ? তাঁহার স্বভাব কিরূপ ছিল ? [১+১+১]

৩। "বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।"—এইখানে কাহার কথা বলা হইয়াছে? তাঁহার বীরত্বের কথা লিখ। [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

১। 'বাবাজী আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" কাহার রচিত কোন্ রচনার অংশ? বক্তা কে? কাহার সম্পর্কে বলিতেছেন? এইরূপ বলিবার কারণ বুঝাইয়া দাও।

[২+১+১+৪]

২। "তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।"

কাহার রচিত কোন্ রচনা হইতে উৎকলিত হইয়াছে? কাহার সম্পর্কে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে? ইহা হইতে তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণা হয় তাহা বল।

[২+২+৪]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন:

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর: মধ্যাহ্ন, গর্ভিণী, আনুগত্য, আক্রোশে, মুক্তকণ্ঠে, কপটবাচী, একাহারী, সহচর, পদব্রজে।

২। পদান্তর কর: তিরস্কার, আচরণ, আনুগত্য, উপদ্রব, ভীত।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: সন্নিহিত, প্রত্যাশা, উদ্ধত, অত্যাচার।

Vidyasagara mentions some salient features of the character of his grandfather. He himself inherited some of them too.





বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ-ঘোষণা ঃ বিদ্যাসাগর মশাই-এর পর বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাঙলা সাহিত্য প্রথম নানারকম রচনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম লিখিলেন উপন্যাস, গল্প, নানা জাতীয় প্রবন্ধ। কত রূপ, কত বৈচিত্র্য। এইখানে আমরা বঙ্কিমের একটি ছোট্ট মিষ্টি রচনা পড়িব।

মূলকথা ঃ বৃষ্টি নামিলে বসুন্ধরা জলময় হয়। বিশুষ্ক বিশ্ব ভাসিয়া যায়। পর্বতের মাথায় চড়িয়া বৃষ্টি বিন্দুগুলি নির্ঝর পথে বাহির হইয়া নদীতে আসিয়া মিশে। বৃষ্টির সহিত যুক্ত বায়ু মিশিয়া ঝড়ের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফলে ক্ষেত্রে শস্য হয়—মানুষ বাঁচে।

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক

মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে ?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এই বিশোষিত পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝর-পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু ? ইস্‌! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইব। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকিব। বায়ু! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই! চল, আমরা বৃষ্টিবিন্দু, কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ, লতা, বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে ? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ! আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছ-পালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে, কেবল বেনে-বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর পাপিষ্ঠা,

তুই এক খানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে বেটীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ! দেখ, পর্বতকন্দর দেশপ্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকার তটিনীকে কূলপ্লাবিনী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে? [সংক্ষেপিত]

নির্দেশিকা: বঙ্কিমচন্দ্র বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে সজীব প্রাণী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় বৃষ্টির জীবন-কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। "চল নামি"—কাহারা নামিতে চাহিতেছে? কখন নামিবে? কাহারা পৃথিবী ভাসাইবে? কে ক্ষুদ্র? বৃষ্টি বিন্দুগুলি কিভাবে পৃথিবীতে নামে? বৃষ্টির ফলে পৃথিবীর কি উপকার হয়? [১+১+১+১+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বৃষ্টি বিন্দু বলবান্ হইল কি করিয়া? [৩]

২। বৃষ্টির আগমনে পৃথিবীর আহ্লাদ বর্ণনা কর। [৩]

(প্রতিটি ৮ নম্বর)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। "দেখ, যে একা……সে-ই তুচ্ছ।"

২। "ঐক্যেই বল।"

(প্রতিটি ১ নম্বর)

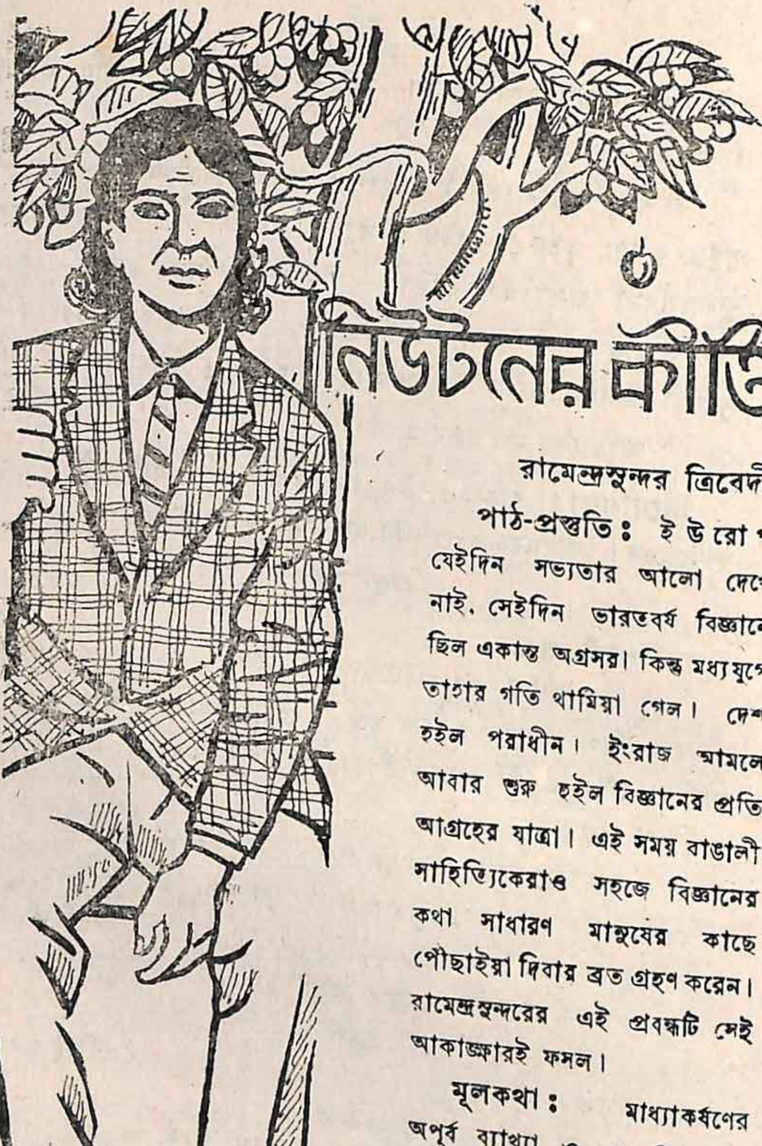
ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর :
রবি, নির্ঝর, বসন, মহাকল্লোলে, ভীমবাদ্য, তরঙ্গ, আহ্লাদ, পাপিষ্ঠা, বিশীর্ণা, তটিনী, কূল।

২। পদ পরিবর্তন কর : পৃথিবী, বিশোষিত, তরঙ্গ, বল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :
পৃথিবী — করিব। — — কি ক্ষুদ্র! — মত ক্ষুদ্র — ? আমাদের — — কে?

Characteri doo and results of rains.



নিউটনের কীর্তি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পাঠ-প্রস্তুতি : ইউরোপ যেইদিন সভ্যতার আলো দেখে নাই, সেইদিন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে ছিল একান্ত অগ্রসর। কিন্তু মধ্যযুগে তাহার গতি থামিয়া গেল। দেশ হইল পরাধীন। ইংরাজ আমলে আবার শুরু হইল বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের যাত্রা। এই সময় বাঙালী সাহিত্যিকেরাও সহজে বিজ্ঞানের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবন্ধটি সেই আকাঙ্ক্ষারই ফসল।

মূলকথা : মাধ্যাকর্ষণের অপূর্ব ব্যাখ্যা ও গ্রহাদির সূর্য পরিক্রমণ-কথা উদাহরণ সহযোগে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন সেই বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। গ্যালিলিও ইটালী দেশবাসী ছিলেন। গ্যালিলিও "পেণ্ডুলম যুক্ত"

ঘড়ি বাহির করেন। তিনি খুব বড় লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড় লোক।

তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন; এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেলফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

অনেকে সন্দেহ করেন, গল্পটা হয়ত আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। এক-দিনে অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই; এবং বহু বৎসর তিনি এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার।

একটা ফল হাত হইতে ফেলিলে উপরে না যাইয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে চলে। ইহা তোমরাও জান, নিউটনও জানিতেন, তাহার পূর্বেও লোকে জানিত। পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিলে, সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইল। নূতন কথা কিছুই হইল না। নিউটন এমন নির্বোধের মত লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু

তাহাই নহে। প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কি? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই— পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে চাহিতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পারে না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। বলিবে—কৈ চন্দ্র ত কতদিন আমাদের মাথার উপর উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ?

কিন্তু আশ্চর্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যেদিন চন্দ্রের সৃষ্টি সেদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবার দিকে পড়িতেছে, এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক:নীচে পড়ে। বেগে

সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিষটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। আরও বেগে দিলে হয়ত দু'শ-তিনশ কি দু'হাজার তিন হাজার হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগে দিতে পারিলে হয়ত গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেইরূপ দিতে পারি না, তাই অতদূর যায় না। অধিক বেগে দিবার উপায় থাকিলে আমরা উহাকে মক্কা কেন আফ্রিকা পার করিয়া আটলান্টিক সাগরে ফেলিতে পারিতাম। যত দূর যাক পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া একবার পৃথিবীটা ঘুরিয়া আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছ-ছাড়া হইতে পারিত না।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইত।

একগাছি লম্বা সূতার একপ্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর ডান হাতে দু'টি আঙ্গুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও, সূতাগাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলে দেখিবে ঢিলটি আবার স্বস্থানমুখে চলিল—যেন সেই স্বস্থানের দিকে তাহার একটা টান আছে। যেখানে ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে আবার সেই

স্থানেই যাইবে, কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ, আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেরূপ রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকেই যাইতে চাহে; তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে, পৃথিবীর নিকট যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে অনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকে ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্যপথে যাইবার যো নাই। তবে বলদ ঘানিগাছে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা থাকে, তাই ঘানিগাছের দিকে তাহার টান। আর চন্দ্র পৃথিবীর দিকে সেইরূপ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোন দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা আছে কিনা তাহা জানি না। নিউটনও তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যান নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরো কতকগুলি পদার্থ কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় কলুর বলদের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে তাহা আমরা জানি না।

হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে, আম, নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য যাহার মধ্যস্থল—সাড়ে চার কোটী ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি

সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে, সর্বত্র একই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও ইহার দিকে চলিতেছে।

স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

আলোচনা: নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব কত সহজে বুঝাইয়াছেন লেখক। গভীর তত্ত্বকথা সরস হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের বলিবার রীতিটি বুঝিতে চেষ্টা করিবে। নিজে ঐরূপ লিখিবার চেষ্টা করিবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন:

১। নিউটনের প্রধান কীর্তি কি? লেখকের যুক্তি অনুসরণ করিয়া বুঝাও। [২+৮]

২। "এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন"—নিউটন সম্বন্ধে গল্পটি কি? গল্পের মূল সত্য কি? তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও। [৩+২+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। "আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন"—সেই কথাটি কি? বুঝাইয়া লিখ। [১+২]

২। "যেন সেই স্বস্থানের দিকে তাহার একটা টান আছে"—কাহার টানের কথা বলা হইতেছে? উদাহরণ সংযোগে কথাটি বুঝাইয়া দাও। [১+২]

৩। শুধু কি পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে? "নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন।" নিউটন আমাদিগকে কি চিনাইয়াছেন।" [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

১। 'পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ……আকর্ষণ করে।'

২। 'এই যে একটা প্রকাণ্ড……দিকে চলিতেছে।'

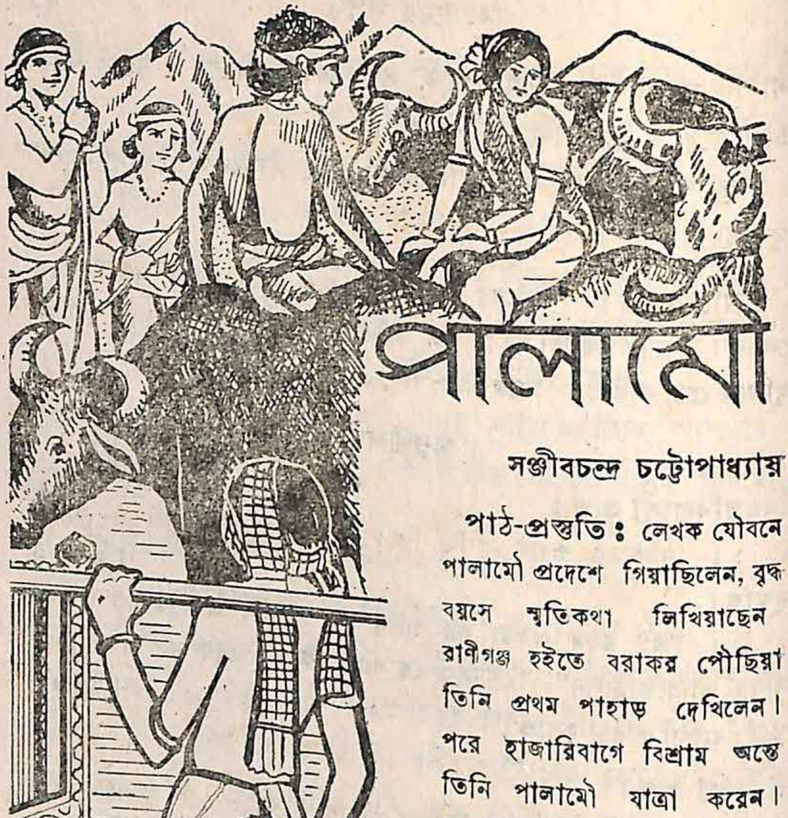
ব্যাকরণগত প্রশ্ন:

১। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর: দ্রব্য, অকস্মাৎ, বাহাদুরী, দূরস্থিত, আশঙ্কা, স্বস্থান, রজ্জুবদ্ধ, অগোচরে, ক্রোশ, কীর্তি।

২। পদ পরিবর্তন কর: আবিষ্কার, আকর্ষণ, প্রমাণ, সৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর: নিউটন — এইটুকু — যে, আম, নারিকেল যে — ও — — পড়ে, — ঠিক সেই নিয়মে — — ঘুরে।

A Scientific story of discovering the law of gravitation by Newton.



পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ-প্রস্তুতি : লেখক যৌবনে পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পৌছিয়া তিনি প্রথম পাহাড় দেখিলেন। পরে হাজারিবাগে বিশ্রাম অন্তে তিনি পালামৌ যাত্রা করেন। পথ বৃক্ষ-বিরল, কোথাও বনজঙ্গল ও পাহাড়, কোথাও পথের মধ্যে গোরুর গলায় কাঠের ঘণ্টা, মাঠে কালো-পাথর-কোঁদা মূর্তির মত দেখিতে রাখাল বালক—তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়াছিল।

বহুকাল হইল একবার আমি পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই একজন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি।

তাৎপর্য, বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন আর না শুনুক, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নেই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোনও প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ী থামিল। কুলীর সাহায্যে নদী পার হইয়া আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি?

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগে পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবা মাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে

বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকতক বাঙালী আসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলে সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করিলাম তিনিই বাটীর কর্তা। তিন শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

আহারাদি সমাপনান্তে, রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না; এবার ইচ্ছা রহিল মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি কথা অতিরিক্ত বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ

অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরো কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তারপর পাহাড়, আবার পাহাড়—যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।

অপারাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়-পার্শ্বস্থ লতাপল্লব স্পর্শ করিতে লাগিল।

বন দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠ-ঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতরে কেমন করে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরো যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কিনা, বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন আর গ্রাম বেশী দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়া-বৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তলায় কতকগুলি কোল বালক একত্র

মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই। সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষ-পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ মহিষ-পৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সবগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কাল পাথর, পশুরা পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

আলোচনা: ম্যাপ দেখিয়া পালামৌ-এর যাত্রাপথ বাহির করিবে। লেখকের সরস মন্তব্যগুলি খুঁজিয়া বাহির কর। ঐগুলি আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন:

১। লেখক কোন সময় পালামৌ বেড়াইতে গিয়াছিলেন? কখন তিনি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলেন? তাঁহার দৃষ্টির কি পার্থক্য ঘটিয়াছে? সংক্ষেপে ভ্রমণকথা বল। [১+১+২+৬]

২। পালামৌ কোথায়? কলিকাতা হইতে পালামৌ যাইতে হইলে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়? যাত্রাপথের বর্ণনা দাও। [৩+৩+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। লেখক কোথায় হইতে যাত্রা করিলেন? লেখকের গাড়ী কোথায় থামিল? কি দেখিয়া লেখকের আনন্দ হইল? [১+১+১]

২। "আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি"—কথাটি কে, কখন, কাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন? [১+১+১]

৩। লেখক পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন কেন? পালামৌ প্রবেশ করিয়া লেখক কি দেখিলেন? লেখকের পাল্কীর দিকে দৃষ্টিতে কে চাহিয়াছিল? [১+১+১]

৪। 'পাথুরে' ছেলেগুলি দেখিয়া লেখকের কি মনে হইয়াছিল ? [৩]

৫। "বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ"—কথাটির অর্থ বুঝাইয়া লিখ। [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। (ক) 'পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই।'

(খ) 'গল্প করা এ বয়সের রোগ ; কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।'

(গ) 'বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম।'

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর : বৃত্তান্ত, গোপথ, মধুর, কর্ষিত, কুসুমিত, কণ্টকাকীর্ণ, নিরীক্ষণ, সমাপনান্তে, সংখ্যাতীত, কর্ণগোচর।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

যেরূপ — তাহাতে এই 'পাথুরে' — — বলিয়া বিশেষ — দেখাইতেছিল। — কাল পাথর — 'পাথুরে' — রাখিলেও —।

৩। পদ পরিবর্তন কর : পর্বত, আনন্দ, ভ্রম, প্রসন্নতা, আচ্ছাদিত, অবসন্ন, দৃষ্টি।

———

The writer's experience to the journey of Palamow has been nicely des -cribed.



বাংলার চাষী গফুর



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ-প্রস্তুতি : শরৎচন্দ্রকে সাধারণ লোকে দরদী কথাশিল্পী বলে। সত্যিই তাঁহার আগে বাঙলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কথা এত দরদের সহিত কেহ লিখেন নাই। এইখানে এক অক্ষম বুড়ো ষাঁড়ের প্রতি বাঙলার এক সাধারণ চাষীর ভালবাসার গল্প বলা হইয়াছে।

বক্তব্য-সংকেত : এই গল্পটিতে মহেশের প্রতি গফুরের গভীর স্নেহ প্রকাশ পাইয়াছে। গফুরের অসহায় অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বাংলার কৃষক সমাজের দুর্গতি ও জমিদারদের হৃদয়হীনতার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরো ছোট, তবু, তাঁর দাপটে প্রজারা টুঁ শব্দ করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উঠিয়া যাইতেছে। এই মাঠের সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওরে, ও গফরা, বলি, ঘরে আছিস ?"

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটি ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি ? এ হিদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ? সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গো-হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কি করবো বাবাঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আন্‌ব,—তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর ? লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে প'ড়ে ; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আল্‌গুলো সব জলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে,—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর ?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু-আঁটি বিচুলি ফেলে দেনা ততক্ষণ, চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি ? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক্।"

গফুর জবাব দিলনা; নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি কর্‌লি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌-রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে সে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কর্ত্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদেকেটে হাতেপায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, "ইস্! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ। হেঁসে বাঁচিনে।"

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেলনা, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক্ খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলনা।—বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই,—খেয়ে রেখেছিস্, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম-রাজত্বে বাস করিস—ছোট লোক কিনা, তাই তার নিন্দে করে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরবো কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দু'বেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে

পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বৃষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে এক কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজর গোণা যাচ্ছে,—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দু'দিন পেট পুরে খেতে দিই,—তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবেনা। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ আমার অবোলা জীব—কথা ব'লতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি করে শুনি? আ মর্! শিঙ্ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি?"

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েছে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটেনা, চালকলা খাওয়া চাই। নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ্, কোন্ দিন দেখ্‌ছি কাকে খুন ক'রবে।" এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, সে কহিল, তোকে দিল না এক মুঠো; ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্ গে।—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তারপর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায়, মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল,— "মহেশ, তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের আটসন্ প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে,—কিন্তু তুইত জানিস্, তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল।

গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল,—জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শশ্মান ধারের গায়ে যে গোচরটুকু ছিল, তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি ক'রে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই তাহার দুই চোখ বাহিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গফুর একবার এদিকেওদিকে চাহিল, তারপর ভাঙ্গা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিল,—নে, শীগ্‌গীর ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—। "বাবা, ভাত খাবে এসো,"—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ, বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল; লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড়, মা, আপনি ঝ'রে যাচ্ছিল—

আমি যে শুন্‌তে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কোরছ?

না না, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা প'ড়ে যাবে, বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটি মাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে এবং এমনধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, একথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে? অথচ, এই উপায়েই বা ক'টা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এস বাবা।

গফুর কহিল, ফ্যান্‌টুকু দেত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই। ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতে ম'রে গেছে। নেই! বলিয়া গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এতটুকুও যে নষ্ট করা যায়

না, এই দশ বারো বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে, মা, জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় খিদে পেয়েছে?

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না, মা!

তাহ'লে তুলে রেখে দি সাঁজের বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে যে অসুখ বাড়বে।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল,—এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে, আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারবো।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতার ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা আরো একজনই বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

নিজের বলদের প্রতি চাষীর মমতা কিরূপ!
আলোচনা: লক্ষ্য কর। পুরোহিত তর্করত্ন মুখে যতবড় কথাই বলুন না কেন, গরুর প্রতি তাঁহার
আন্তরিক মমতা নাই। আবার আমিনা খড় টানিয়া দিলে বকিয়া থাকে বটে
কিন্তু ভাতের থালা সে বুঝিয়াই মহেশকে দিয়া দেয়। আসলে ষাঁড় হইয়াও
মহেশ গফুর-আমিনার নিকট-আত্মীয়।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। কোথায় হইতে ফিরিবার পথে তর্করত্ন গফুরকে ডাকেন? তাহাদের কথা-বার্তা সংক্ষেপে বল। এই কথাবার্তা হইতে গফুর কি সিদ্ধান্ত করে? [৩+৫+২]

২। আমিনা গফুরকে ধমক দিয়াছিল কেন? গফুর সেই দিন ভাত খাইল না কেন? ভাতের থালা মহেশকে দিবার কালে আমিনার মনোভাব কিরূপ হয়? ইহা হইতে তাহার ও গফুর সম্পর্কে কি বুঝা যায়? [২+২+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'তোকে দিল না এক মুঠো; ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্‌গে।"—এই কথা কে, কাহাকে, কি অবস্থায় বলিয়াছিল? [৩]

২। "পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা আরো একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন"—"ছলনার অভিনয়" বলিতে লেখক কোন্ ছলনাকে বুঝাইতেছেন? [৩]

৩। "এ আমার অবলা জীব—কথা ব'লতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"—এই অবোলা জীবটি কে? কেন তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে? কে, কাহাকে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিল? [১+২++২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। "ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না।" কাহার রচিত কোন গল্প হইতে উদ্ধৃত? এইকথা কে, কাহাকে বলিয়াছে? বক্তব্যের তাৎপর্য কি? [২+২+৪]

২। "পিতা ও কন্যার মাঝখানে……লক্ষ্য করিলেন।" পিতা ও কন্যা কে? কি ছলনার অভিনয় হইল? অন্তরীক্ষে থাকিয়া কে লক্ষ্য করেন? ইহার তাৎপর্য কি? [২+২+২+২]

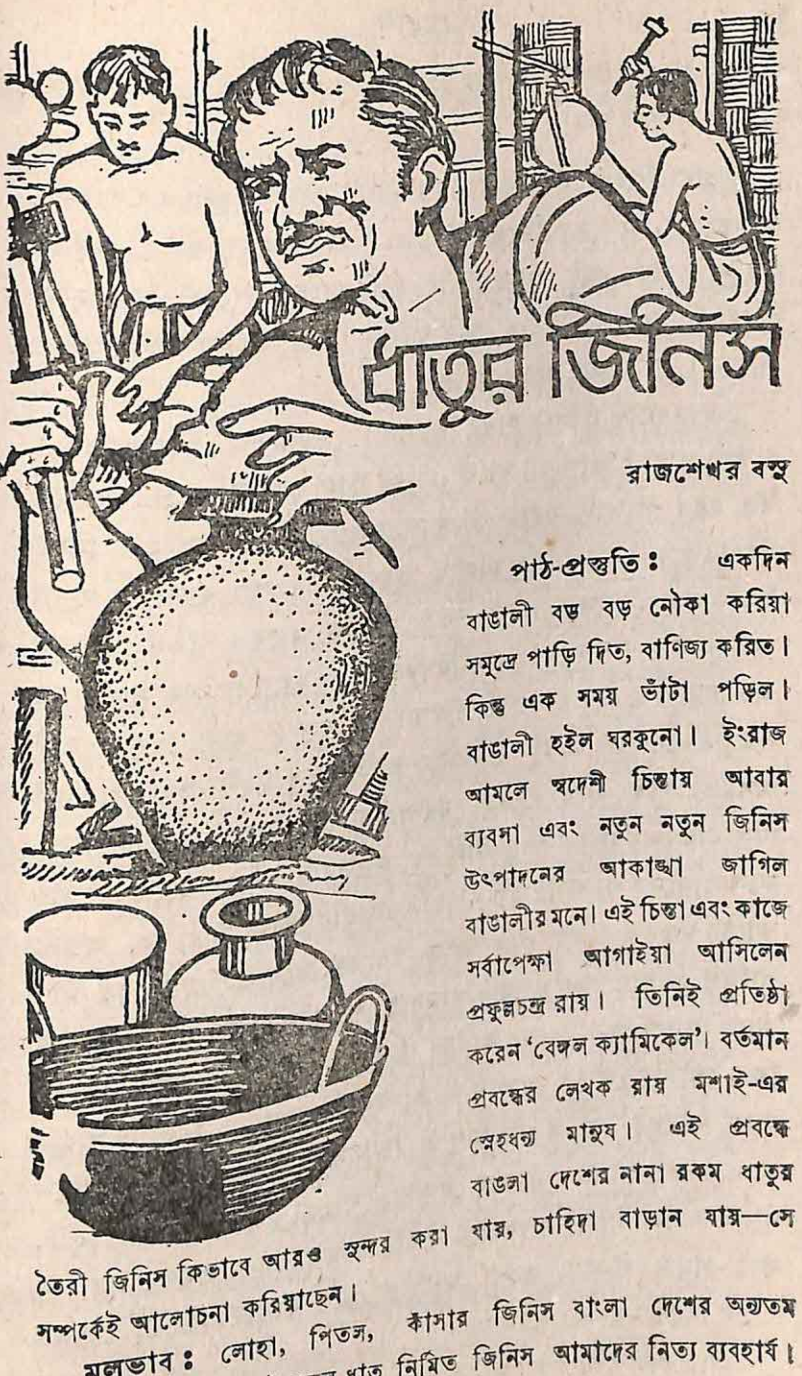
ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর :—দ্বি-প্রহর, অনাবৃষ্টি, ধরিত্রী, নিরন্তর, অশ্রু, সানকী, উদ্বিগ্ন, অন্তরীক্ষ।

২। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) 'পিতার ও কন্যার……লক্ষ্য করিলেন।'
(খ) 'মহেশ, তুই আমাদের……কত ভালবাসি।'

৩। পদ পরিবর্তন কর : উদয়, লজ্জিত, নিবিড়, উদ্বিগ্ন, চিন্তা, অভিনয়।

The story of affection to a domestic pet. It also describes the miseries of ... poor Bengal ...



ধাতুর জিনিস

রাজশেখর বসু

পাঠ-প্রস্তুতি : একদিন বাঙালী বড় বড় নৌকা করিয়া সমুদ্রে পাড়ি দিত, বাণিজ্য করিত। কিন্তু এক সময় ভাঁটা পড়িল। বাঙালী হইল ঘরকুনো। ইংরাজ আমলে স্বদেশী চিন্তায় আবার ব্যবসা এবং নতুন নতুন জিনিস উৎপাদনের আকাঙ্খা জাগিল বাঙালীর মনে। এই চিন্তা এবং কাজে সর্বাপেক্ষা আগাইয়া আসিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গল ক্যামিকেল'। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক রায় মশাই-এর স্নেহধন্য মানুষ। এই প্রবন্ধে বাঙলা দেশের নানা রকম ধাতুর তৈরী জিনিস কিভাবে আরও সুন্দর করা যায়, চাহিদা বাড়ান যায়—সে সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন।

মূলভাব : লোহা, পিতল, কাঁসার জিনিস বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান কুটির শিল্প। এই সকল ধাতু নির্মিত জিনিস আমাদের নিত্য ব্যবহার্য।

ইহাদের প্রসার ও উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে শিল্পীদের জীবন-যাত্রা উন্নত হইবে।

লোহা পিতল কাঁসার জিনিস তৈরী এদেশে কুলগত ব্যবসায়, আগন্তুকের পক্ষে তা শিখে জীবিকা নির্বাহ করা সহজ নয়। কিন্তু যাঁর বুদ্ধি আর রুচি আছে তিনি কারিগরকে উপদেশ দিয়ে নূতন ধরণের বা উন্নততর জিনিস তৈরি করিয়ে নিজে বেচবার ব্যবস্থা করতে পারেন। দু' একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বহরমপুরের কাঁসার বাসন বিখ্যাত। সেখানকার সর্বোত্তম কাঁসায় ৭ ভাগ তামা ২ ভাগ রাং থাকে। এই কাঁসা ঢালাই-এর পর পিটিয়ে গড়া হয়। রং ভাল, সহজে ভাঙে না, কলঙ্কও সহজে পড়ে না। নিকৃষ্ট কাঁসায়—যা থেকে কেবল ঢালাই করে বাসন গড়া হয়—রাং ছাড়া দস্তাও থাকে, অনেক সময় একটু সীসেও থাকে। কিন্তু ভালমন্দ কোনও কাঁসার বাসনের গড়ন নিখুঁত নয়। গেলাসের ফাঁদ সাধারণতঃ এত বড় করা হয় যে হাত দিয়ে ধরা শক্ত। থালা গেলাস বাটি সব জিনিসের গা একটু উঁচু-নীচু, পালিশ যত বেশী করা হয়, এই অসমতা ততই ফুটে ওঠে। কাঁসারীরা যে কুঁদযন্ত্র ব্যবহার করে, চালাবার সময় তাতে কিছু টাল হয়, হাতের বাটালিও কাঁপে। তার ফলে বাসনের গা অসম হয়। যদি লোহার লেদে কোঁদা হয়, অন্ততঃ কাঠের মজবুত অনড় কুঁদে কাজ করা হয়, তবে এই দোষ হয় না। পালিশ করবার আগে যদি শানযন্ত্রে গা ঘ'ষে মসৃণ করা হয় তবে আরো সুদৃশ্য হয়। এসব ব্যবস্থা করলে অবশ্য খরচ কিছু বাড়বে, কিন্তু শৌখিন লোকে রূপোর বা রূপোর লেপ দেওয়া বিলাতি খাবার বাসন বা প্লেট-এর মতন নিখুঁত জিনিস পেলে ভাল দাম দিতে আপত্তি করবে না। কাঁসার যে চামচ পাওয়া যায় তার গড়ন বিশ্রী, মাপও সমান নয়। সাবধানে তৈরি করলে ভাল জর্মণ-সিল্‌ভারের কাঁটা-চামচ, টি-পট, জাগ প্রভৃতির চেয়ে কাঁসার জিনিস কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয় বরং নূতনতর।

আজকাল ষ্টেনলেস্‌ ছুরির চলন হয়েছে। পালিশ করা কাঁসার

ছুরি প্রায় তার সমকক্ষ হ'তে পারে। লৌহ পূর্ব যুগে ব্রোঞ্জ বা কাঁসার ক্ষুরেই লোক দাড়ি কামাত।

কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থানের ছুরি কাঁচির সুনাম আছে। বিলিতীর তুলনায় দাম খুব কম, কিন্তু জর্মণ জিনিস আরো সস্তা পাওয়া যায়। হুঁশিয়ার লোকে তবু দেশী পছন্দ করে, কারণ সস্তা জর্মণ ছুরি কাঁচি বেশী ভঙ্গুর। দেশী জিনিসের দোষ—তার চেহারা তত ভাল নয়, কাঁচির ফলার যে ঈষৎ বক্রতা আবশ্যক তাও দেশী কাঁচিতে প্রায় ঠিক হয় না। এ বিষয়ে আলিগড়ের কারিগর বেশী সতর্ক। উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে তৈরি হলে এই সব ত্রুটি দূর হ'তে পারবে, খরচ যেমন বাড়বে জিনিসের আদর আর দামও তেমনি বাড়বে।

অসংখ্য পরিবারে জাঁতি একটা অপরিহার্য অস্ত্র, শৌখিন জাঁতির আদর আছে। জাঁতির হাতল ছুটির গড়ন চিরকাল একই রকম চ'লে আসছে—ছুটি সোজা গোলাকার দণ্ড। একটু বদলালে ধরবার আর চাপ দেবার সুবিধা হয়, তাতে হাত শ্রান্ত হয় না। কিন্তু জাঁতি-নির্মাতা সেদিকে নজর দেয়নি। বিলাতি প্লায়ার্সের হাতল চেপটা ধনুকের মত বাঁকা, সেজন্য ব্যবহারে সুবিধা। জাঁতির হাতল যদি ঐ রকম হয়, তবে লোকে খুশী হয়ে কিনবে। রান্নার জন্য যে সাঁড়াশী ব্যবহার হয় তারও বাঁকা হাতল হতে পারে।

বোম্বাই অঞ্চলে চায়ের বাটী রেকাব রাখবার জন্য একরকম আধার প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ লোহার পাতের বা গাঁটবাধা হালের (hoop iron) তৈরি, কাঠেরও হয়। অতি ছোট জিনিস দেওয়ালে টাঙানো থাকে। পিছনে একটা খোপ, তাতে ছটা রেকাব খাড়া করে রাখা হয়, আর সামনে পাশে ছটা হুক, তাতে বাটি ঝোলানো হয়। যে-সব গৃহস্থের বাড়ীতে অত্যন্ত স্থানাভাব সেখানে এইরকম আধার সুবিধাজনক।

লোহার বা ইস্পাতের তারের খোঁপার কাঁটা আর সেফটিপিনের খুব কাটতি। এই দুইটি জিনিস বাজারের সাহায্য না নিয়েও তৈরি করা যেতে পারে। কাঁটা যত লম্বা হবে তার দ্বিগুণ চওড়া একটা

কাঠের পাটায় তার জড়ানো হয়, তারপর তারের কুণ্ডলী খুলে নিয়ে মাঝামাঝি কেটে ফেললে ভাঁজ করা অনেকগুলি কাঁটা পাওয়া যায়।

যদি কাঁটার ডালে ঢেউ দরকার হয় তবে তা উপযুক্ত সাঁড়াশী দিয়ে চেপে করা হয়। তারপর ঘুরন্ত শানে কাঁটার ডগা ঘষা হয় এবং অবশেষে কাল বার্ণিশে ডুবিয়ে তারের আলনায় শুখানো হয়। সেফটিপিন তৈরি করাও সহজ, কিন্তু যেদিকে কাঁটা আটকানো হয় সেদিকে যে ভাঁজ করা পাত থাকে তা তৈরী করবার জন্য ছোট ডাই-প্রেস দরকার। তা ছাড়া নিকেল-প্লেট করবার সরঞ্জামও চাই। পিতলের পালিশ ও ল্যাকার করা সেফটিপিন করলে এত আয়োজন দরকার হয় না, পাত না দিয়ে শুধু এক দিকের তার বাঁকিয়ে খাঁজ করলে তাতেও কাঁটা আটকানো যায়।

কলকাতার কাছাকাছি অনেক জায়গায় লোহার বা গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ তারের নানা রকম জিনিস তৈরি হয়, যেমন ইঁদুর-ধরা কল, পাখির খাঁচা, চিঠির ট্রে, বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি, খাবারের ঢাকনা, শিকে ইত্যাদি। এই কাজে সরঞ্জাম বেশী লাগে না, শেখাও সহজ।

কলকাতার উপকণ্ঠে, হাওড়ায় এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রামে কুটিরশিল্পরূপে ঢালাই পিতলের অনেক রকম জিনিস তৈরী হয়। এই কাজের উপাদান পুরাণো পিতল বা গান মেটালের টুকরো বা ছাঁট। কারিগর সপরিবারে কাজ করে, মেয়েরা গলাবার মুচি আর ঢালাই-এর জন্য মাটির ছাঁচ গড়ে, পুরুষরা হাপর চালায় এবং গলা ধাতু ছাঁচে ঢালে। পিতলের কব্‌জা, ছিটকিনি, আলনার হুক, জলের কল, ষ্টিমকক্‌, বিজলী বাতির ব্র্যাকেট, বাক্স-আলমারির কল, তালা, চাবি প্রভৃতি নানা জিনিস তৈরী হয়। অনেকে শুধুই ঢালাই করে কোরা মাল অন্য কারখানায় যোগান দেয়, সেখানে বাকী কাজ হয়। আবার অনেকের নিজেরই লেদ, ড্রিল, শান প্রভৃতি যন্ত্র আছে, তাতে কোঁদা, ফুটো করা, ঘষা ও পালিশ সম্পূর্ণ করে বাজারে জিনিস দেয়।

আজকাল অনেকের বাড়িতে দিনরাত অবিরাম কাজ চলেছে,

লাভও ভাল হচ্ছে। যুদ্ধের আগেও এই ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভবিষ্যতে আরো বিস্তারে সম্ভাবনা আছে।

আলোচনা : লেখক এই আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালা দেশের নানা শিল্প ও স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানগুলি ম্যাপে দেখিয়া লইবে।

খাতায় একটি তালিকা তৈয়ারী করিও। তাহার প্রথমে থাকিবে শিল্পের নাম, দ্বিতীয় ভাগে শিল্পস্থান, তৃতীয় স্তম্ভে শিল্পটির বর্তমান অবস্থা এবং নবীনতা আনিতে লেখকের প্রস্তাব সম্পর্কে লিখিবে। দেখ, সমস্ত প্রবন্ধ সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। কুলগত ব্যবসায় কাহাকে বলে? এই ব্যবসায় কিরূপ পরিবর্তনের কথা লেখক বলিয়াছেন? একটি উদাহরণ দাও। [২+৩+৫]

২। বহরমপুরের বিভিন্ন রকম কাঁসার উৎপাদনগুলি সম্পর্কে বল। এখানকার বাসনের কি কি খুঁতের কথা লেখক বলিয়াছেন? কি কি উপায়ে ঐ ত্রুটি সংশোধন হইতে পারে? [৪+৩+৩]

৩। 'ধাতুর জিনিস' প্রবন্ধে লেখক দেশ-বিদেশের ছুরি-কাঁচি লইয়া যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিজ ভাষায় বল। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য বল। [৬+৪]

৪। কলিকাতার উপকণ্ঠে ঢালাই পিতলের শিল্পের কথা নিজের ভাষায় বল। গোটা পরিবার কিভাবে কাজ করে? কি কি জিনিস তৈয়ারী হয়? কে, কিরূপে বাজারে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে? [২+৩+৩+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। নিকৃষ্ট কাঁসায় কি কি উপাদান থাকে? [৩]

২। জাঁতি কিভাবে আরও উপযোগী করা যায়? [৩]

৩। কিভাবে কাঁটা তৈরী করা হয়? [৩]

৪। লোহার বা গ্যালভানাইজ ও তারের কি কি জিনিস তৈরী হয়? [৩]

৫। কোরামাল কাহাকে বলে? কোরামাল অনেকে কি করে? [২+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লিখ : কুলগত, কাঁসারী, মসৃণ, সরঞ্জাম, অবিরাম, সাঁড়াসী।

২। পদান্তর কর : উপদেশ, অসমতা, আদর, অবিরাম, প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহার।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : গোলাকার, অত্যন্ত, স্থানাভাব, তত্ত্বাবধান।

The importance of metal product in cottage industries and the artisans.



যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

ডঃ নীরদবরণ হাজরা

পাঠ-প্রস্তুতি : শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনার দ্বারা তাঁহার জীবিত কালেই 'যুগদেবতা,' 'যুগাবতার' নামে অভিহিত হন। উনবিংশ শতকে যখন ধর্মে ধর্মে সংঘাত,—তখন রামকৃষ্ণদেব এক আশ্চর্য উদার বক্তব্য উপস্থিত করিলেন—যত মত-তত পথ। সত্যই ত' সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক—তবে কেন এত বিরোধ! এই আদর্শের কথা বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সভায় সকলের জয়মাল্য লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বিবেকানন্দের গুরু ও স্রষ্টা।

ভাববস্তু : লেখক এইখানে খুব সংক্ষেপে রামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও ধর্মমতের কথা বলিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও বক্তব্য বিশদ।

কামারপুকুর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার একটি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—মাতা চন্দ্রমণি। ক্ষুদিরাম শিশুটির নাম রাখেন গদাধর।

চন্দ্রমণি ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। প্রতিদিন অপরাহ্ন পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন যদি কেউ অভুক্ত এসে পড়ে—এই ভেবে। কতদিন এমন হয়েছে যখন তাঁকে নিজের আহার্য অপরকে দিতে হয়েছে, আর নিজে কাটিয়েছেন অনাহারে। আর ক্ষুদিরাম ছিলেন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। গ্রামের জমিদার তাঁকে মিথ্যা মামলায় সাক্ষ্য দিতে বলেছিলেন। কিন্তু ক্ষুদিরামের সাফ জবাব—তিনি তা পারবেন না। ফলে জমিদারের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি। শেষটা আশ্রয় নিলেন কামারপুকুরে।

গদাধর একটু বড় হলে তাঁকে পাঠশালায় পাঠানো হয়। লেখা পড়ায় তাঁর একেবারেই মন নেই। শেষটা পাঠশালায় যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেন! কথকতা, পুরাণ-পাঠ যা কিছু হয়, সব শোনেন মন দিয়ে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার শুনেই গোটা পালাটা যথাযথ আবৃত্তি করতে পারতেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর! শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

গদাইয়ের বয়স তখন চৌদ্দ। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বড়দা রামকুমার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলকাতা এসে টোল খুললেন। গদাইকে নিয়ে তাঁর মহাভাবনা। লেখা পড়া ছেড়েছে—যাত্রা করে বেড়ায়। কাজেই রামকুমার গদাইকে নিয়ে এলেন কলকাতায়—যদি এখান থেকে কিছু লেখাপড়া হয়।

রাণী রাসমণি গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে এক নতুন মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কালী, রাধাকৃষ্ণ আর শিবের মূর্তি। রাণী গদাইকে মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত করলেন।

মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে যান গদাই। কেঁদে ওঠেন শিশুর মতো—শিশু যেমন কাঁদে মায়ের জন্যে। "আমি আর কতদিন বসে থাকবো মা? তুই কি শুনতে পাস্ না? তুই

কি সত্যি সত্যি পাষাণী মা!" আবার গানের মধ্যে দিয়ে, আদর-আবদারের মধ্যে দিয়ে চলে ঠাকুরের পূজো। মন্দিরের বাইরে জনতা এসব দেখে আর ভাবে পূজারী ঠাকুর নিশ্চয়ই উন্মাদ।

গদাধর রাণীমাকে গান শোনান। হঠাৎ গান বন্ধ করে গদাধর রাণীমার গালে এক চড় মারলেন। "এখানে এসে বিষয় চিন্তা!" —ব'লে ঠাকুর উঠে পড়লেন। লোকজন ছুটে এল হাঁ হাঁ করে। রাণী তখন ভাবছেন, ঠাকুর কি অন্তর্যামী। সত্যিই তো তিনি ভাবছিলেন এক বৈষয়িক মামলার কথা। ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরলেন রাণী।

কামারপুকুরে আত্মীয় স্বজন গদাইয়ের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। গদাধর নিজে তখন চন্দ্রমণিকে বললেন, "জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে, সেইতো হবে গো সহধর্মিণী"। গদাইয়ের ইঙ্গিতে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল। সারদামণি মিলিত হলেন গদাধরের সঙ্গে।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন এক সন্ন্যাসী, নাম তোতাপুরী। তিনি বেদান্ত শিক্ষা আর সন্ন্যাসে দীক্ষা দেবেন গদাধরকে। মাত্র তিন দিনের মধ্যে ঠাকুর সব সাধনার শেষ পর্য্যায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। তোতাপুরী শিষ্যের নতুন নাম রাখলেন—বললেন, "এখন থেকে তোমার নাম হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ত্রেতা যুগে যিনি রাম, দ্বাপরে তিনিই কৃষ্ণ। আর কলিযুগে এক আধারেই রাম ও কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনার কথা ছড়িয়ে পড়লো। রাম মোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রতি। ব্রাহ্মসমাজের মহান নেতা কেশবচন্দ্র সেন হ'লেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো ঠাকুরের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগ্রাহী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র

আসেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। মাইকেল মধুসূদনও এসেছিলেন। ঠাকুরের বাণী শুনে, তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে ধন্য হয় তাঁদের জীবন। ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের মধ্যে আর একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনি হলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। শিক্ষকতা করতেন তিনি। 'শ্রীম' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তিনিই রচনা করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।'

স্কুল-কলেজের ছাত্রও এসে মিলিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন নরেন। এই নরেনই বিশ্ববন্দিত 'বিবেকানন্দ'।

ঠাকুর বলতেন—"ওরে জীবই শিব, কে তাকে দয়া দেখাবে —কার এমন সাহস। তা নয়রে, তা নয়, দয়া নয়, সেবা—মানুষকে ভগবান বলে সেবা কর, তা হলেই হবে?"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে ঠাকুরের গলায় ব্যথা হল। ক্রমেই তা বেড়ে গেল। শরীর দুর্বল হতে লাগল। নরেন ও তাঁর সঙ্গীরা দিনরাত ঠাকুরের সেবা করে চললেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ঠাকুরের কতিপয় গৃহী ভক্ত সমবেত হলেন—কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে। ঠাকুর বাগানে বেড়তে বেড়াতে সহসা নিশ্চল হয়ে গেলেন। সমাধিমগ্ন তিনি। ভক্তদের মনে হল যেন স্বয়ং শঙ্কর সকলের মুক্তি দিতে উদ্যত। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। অন্যান্য ভক্তরাও ছুটে গেলেন। সকলকে আশীর্বাদ করলেন ঠাকুর। তাদের মানবজীবন সার্থক হলো। আগষ্ট মাস এলো। ঠাকুরের দেহ-পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা যেন অনন্তে মিশে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মর্ত্যের লীলা সাঙ্গ করে ফিরে গেলেন ঠাকুর তাঁর 'নিজ নিকেতনে।'

আলোচনা ঃ লেখক সংক্ষেপে এইখানে রামকৃষ্ণদেবের জীবনের সমস্ত তথ্যই তুলিয়া ধরিয়াছেন। দেখা যায় সরল সহজ ভাবণে এই মানুষটি কত গভীর দর্শনের কথাই না জানাইয়া গিয়াছেন। সেই লেখাপড়া না জানা

মানুষটি কোন শক্তিতে সেই যুগের সমস্ত বিখ্যাত মানুষদের কাছে টানিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়।

তোমরা অবশ্যই রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে আরও বড় লেখা পড়িবে।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। রামকৃষ্ণদেবের পিতামাতার নাম ও জন্ম বিবরণ দাও। তাঁহার বাবা-মার প্রকৃতি কেমন ছিল ? প্রত্যেকের সম্পর্কে একটি করিয়া গল্প বল। [৪+২+৪]

২। রামকৃষ্ণদেবের বাল্যকাল কিভাবে কাটে ? কিভাবে তিনি কোথায় কি কাজ পান ? তিনি কিভাবে কার্য সম্পাদন করিতেন ? [৩+৪+৩]

৩। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বল। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের বিশেষ পরিচয় দাও। রামকৃষ্ণের মৃত্যু বর্ণনা কর। [৩+২+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'রাণীমার গালে এক চড় মারলেন।' বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝাও। [৩]

২। গদাধরের নাম রামকৃষ্ণ রাখেন কে ? কেন তিনি এই নাম রাখেন ? [১+২]

৩। গদাধরের বিবাহের পাত্রী কিভাবে পাওয়া যায় ? [৩]

৪। 'শ্রীম' কে ? তাঁহার পরিচয় বল। [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'ফলে জমিদারের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি।'—কোন রচনার অন্তর্গত ? কাহার সম্পর্কে এইকথা বলা হইয়াছে ? কেন জমিদার ষড়যন্ত্র করিলেন ? ইহা দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কি জানিলে ? [১+১+৩+২]

২। "এখানে এসে বিষয় চিন্তা!"—কে, কাহাকে, কখন এই কথা বলেন? ইহা দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কি ধারণা হয়? বিষয় চিন্তা কি? 'এইখানে' বলিতে কোন খানে? সেইখানে কেন বিষয় চিন্তা নয়? [৩+২+১+১+১]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর : অভুক্ত, কথকতা, অলৌকিক, উন্মুখ, সাঙ্গ।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : পর্যন্ত, দক্ষিণেশ্বর, ব্যবস্থা, মহর্ষি, মহেন্দ্র।

৩। পদান্তরিত কর : সাক্ষ্য, মুগ্ধ, বৈষয়িক, আকৃষ্ট।

৪। বিপরীত শব্দ বল : মিথ্যা, বন্ধ, মুগ্ধ, দুর্বল, সাঙ্গ।

The life and teachings of Shri Rama Krishna in brief.



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সংকলক

পাঠ-প্রস্তুতি : আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু ইহার আগে প্রায় দুই শত বৎসর ভারত ছিল পরাধীন। ইংরাজরা ছিল আমাদের দেশের শাসনকর্তা। তাহারা ভারতবর্ষ শোষণ করিয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে আর আমাদের দেশকে করিয়াছে দুর্বল। শত শত দেশপ্রেমিক দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরাজদের অত্যাচার সহিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা। এইখানে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামেরই ইতিহাস বলা হইয়াছে।

মূলকথা : দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর আমাদের দেশ জননী ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের বিপুল স্বার্থত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গ। তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তাহার পর "বণিকের মানদণ্ড" শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হইতে লাগিল। দেশের সাধারণ মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইল।

স্বাধীনতার নূতন চেতনা লইয়া প্রথম উদিত হন রাজা রামমোহন রায়। তখন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। তাঁহার পরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার পিপাসা জাগিতে থাকে। ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হইল। বাংলাই ছিল তাহাতে অগ্রগণ্য—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নেতা।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" প্রথম অধিবেশন বসে। তাঁহাদের দাবী ছিল কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায়। কিন্তু দেশের লোক ক্রমেই এই "আবেদন আর নিবেদনের" থালা সাজাইতে অপমান বোধ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙালীর শত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া "বঙ্গ-ভঙ্গের" আদেশ দেন, তখন দেশের বুকে সমস্ত সঞ্চিত জ্বালা জ্বলিয়া উঠে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে জ্বালা ও অপমান মূর্ত হইয়া উঠে। এই ভাবেই বঙ্গদেশে শুরু হইল স্বদেশী ব্রত ও সক্রিয় আন্দোলন দীক্ষা। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ, বিপিন পাল ছিলেন উহার দীক্ষাগুরু।

বাংলার উপর সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের অবধি রহিল না। স্বাধীনতার আন্দোলন বিপ্লবের পথ নিল। ১৯০৭ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত এই বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছেন। ক্ষুদিরাম হইতে সূর্য সেন পর্যন্ত সেই বিপ্লবী শহীদ ও বীরেরা আমাদের জাতিকে দিয়া গিয়াছেন অভয় মন্ত্র, পূর্ণস্বাধীনতার প্রথম দীক্ষা।

এদিকে সত্যাগ্রহের সার্থক নীতি লইয়া ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে অবতরণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস কলিকাতা অধিবেশনে জালিয়ানওয়ালাবাগ অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রতিরোধ-পথ প্রথম গ্রহণ করিল।

এইভাবে জাতির জনক গান্ধীজীর পরিচালনায় কংগ্রেস নূতন জীবন লাভ করিল; জাতির হৃদয়, 'স্বরাজ্যের' আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী 'অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালনা করেন। ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে লবণ আইনের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত হয় "আইন অমান্য আন্দোলন।" আর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সূচিত হয় 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন।' এই তিন আন্দোলনের মধ্য দিয়া গণচেতনা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

গান্ধীজীর ডাক আসমুদ্রহিমালয় পৌঁছাইল। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য এক হইল। সংগ্রাম নূতন রূপে দেখা দিল। দেশের জ্ঞানী-গুণীরাও আর নিজেদের গৃহকোণে থাকিতে পারিলেন না। পণ্ডিত মতিলাল আসিলেন, সঙ্গে পুত্র জওহরলাল—আসিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি আর শওকত আলি। ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া রিক্ত হইয়া আসিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র। কত মহিলা গৃহকোণ পরিত্যাগ করিলেন। কবিতার কুঞ্জ ছাড়িয়া সরোজিনী নাইডু রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। দেশের তরুণ দল ছাড়িল শিক্ষাক্ষেত্র। চিত্তরঞ্জন তাহাদের লইয়া গড়িয়া তুলিলেন স্বেচ্ছা-সেনাবাহিনী।

ইংরেজ সরকার প্রমাদ গণিল। উৎপীড়ন চলিল—জেল ভরিয়া উঠিল।

আইন করিয়া ইংরেজ দেশের মানুষের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। গান্ধীজী ঠিক করিলেন, এই লবণ আইন সবার আগে ভাঙিবেন। তিনি একদিন আইন ভাঙতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। সুভাষচন্দ্র আগেই গ্রেফ্‌তার হইলেন; জওহরলাল, গান্ধীজীও রেহাই পাইলেন না। পুলিস

গুলি চালাইল—কারাগার ভরিয়া উঠিল, কিন্তু জনগণ দমিলেন না। মহাত্মার সেই সামান্য কয়েকজন শিষ্যের পবিত্র হৃদয়ের বহ্নিতে সেদিন সমগ্র ভারতের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল—ইংরেজের শাসন তাহাতে ঝলসিয়া যেন অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডে পরিণত হইল।

মহাত্মা গান্ধী দেখিলেন, অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে অহিংসার পথ ত্যাগ করিয়া হিংসার পথে চলিতেছে—তখন তিনি এ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ 'স্বরাজ্য দল' নামে নূতন একটি দল গড়িলেন। সুভাষচন্দ্র এই দলের প্রধান কর্মী ছিলেন। সরকার সুভাষচন্দ্রকে ব্রহ্মের জেলে আটক করিলেন। সুভাষচন্দ্র জেল হইতে মুক্তি পাইয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন।

১৯৩৯এ ইউরোপ ও এশিয়ায় দ্বিতীয় মহাসমরের দামামা বাজিয়া উঠিল। ভারতের ইংরেজরাজ বিপন্ন হইয়া কংগ্রেসের সাহায্য চাহিল। কংগ্রেস বলিল—পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে আমরা সকল প্রকার সহায়তা করিব। ইংরেজরাজ অস্বীকার করিলে মহাত্মা আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের ফলে, নূতন ভারত-শাসন-বিধান অনুসারে যে সকল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ফলে, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, আবুলকালাম আজাদ ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ বন্দী হইলেন।

এই সময় নেতৃবৃন্দ বন্দী থাকায় জনসাধারণ অহিংসার পথ ছাড়িয়া হিংসার পথ আশ্রয় করিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইলেন। দেশের সব জেলখানা ভরিয়া গেল। সব চেয়ে বেশী অত্যাচার হইল মেদিনীপুরে। ইহাকে 'আগষ্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বলে।

সুভাষচন্দ্র নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী ছিলেন। একদিন প্রহরীদের চোখে ধূলা দিয়া ছদ্মবেশে তিনি জার্মানিতে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজরা ভারতীয় সেনার সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিল। বহু ভারতীয় সৈন্য বিজয়ী জাপানীদের হাতে বন্দী হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বহু ভারতবাসী ঐ অঞ্চলে চাকুরী ও ব্যবসা করিত। সুভাষচন্দ্র সকলকে লইয়া একটি ফৌজ গড়িয়া তুলিলেন। হিন্দু-মুসলমানে মিলিত এই ফৌজের নাম হইল "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।" ইম্ফলে ভারতের পূর্বসীমান্তে প্রবেশ করিয়া নেতাজী সুভাষ তাঁহার সৈন্য-বাহিনীকে ডাক দিলেন—"দিল্লী চলো। দিল্লীর পথ—স্বাধীনতার পথ!"

কিন্তু হায়রে ভাগ্য! প্রবল বর্ষা নামিল পাহাড়ে, জঙ্গলে। যানবাহন অচল। জাপান আত্মসমর্পণ করিল। নেতাজী সুভাষ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। আর সন্ধান মিলিল না। তবু দেশের মানুষ বিশ্বাস করে, তিনি বাঁচিয়া আছেন।

ইংরাজের সঙ্গে দেশের নেতৃবৃন্দের আবার আলাপ চলিল। ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া সৃষ্টি হইল দুই রাষ্ট্র—ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান। জনগণকে লইয়া কংগ্রেস একদিন অকূল সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট সেই সংগ্রামের তরীখানা আসিয়া ভিড়িল স্বাধীনতার তীরভূমিতে।

আলোচনা: অতি সংক্ষেপে এখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বলা হইয়াছে। তোমরা অবশ্য এই বিষয়ে বড় বই পড়িবে। এখানে যাহাদের নাম পাইলে তাহাদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানিবে। এই প্রবন্ধে নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন শত শত নাম ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। তাহাদের সম্পর্কেও জানা দরকার।

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন:

১। আমরা কখন স্বাধীনতা হারাই? কোন সময়, কাহার দ্বারা প্রথম স্বাধীনতার নূতন চেতনা লাভ করি? রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম নেতা কে? তাহার পর হইতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পর্ব পর্যন্ত বল। [২+২+২+৪]

২। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী কখন যোগ দেন? তাহার পর হইতে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন বন্ধ করা পর্যন্ত সংগ্রামের কথা বল। [২+৮]

৩। সুভাষচন্দ্র কিভাবে কখন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন? কিভাবে ইংরাজরা তাঁহাকে শাস্তি দেয়? তিনি তাহার পর কিভাবে সংগ্রাম চালান? তাঁহার সম্পর্কে লোকে এখনও কি বিশ্বাস করে? [২+২+৫+১]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। কাহাকে জাতির জনক বলা হয়? কেন বলা হইয়াছে? [১+২]

২। বাঙলার শেষ নবাব কে ছিলেন? কবে, কোথায়, কাহার নিকট তিনি পরাজিত হন? [১+২]

৩। কবে, কোথায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে? কে, কখন 'বঙ্গভঙ্গের' আদেশ দেন? [২+১]

৪। "এই তিন আন্দোলনের মধ্য দিয়া গণচেতনা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।"—এই তিনটি আন্দোলন কি কি? [৩]

৫। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য গান্ধীজীর ডাকে কে কে সাড়া দিলেন? লবণ-আইন ভঙ্গ করার ব্যাপারটি সংক্ষেপে লিখ। [৩+৫]

৬। 'স্বরাজ্যদল' কাহারা গড়িলেন? কংগ্রেস কখন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিল? [৩+২]

৭। আগস্ট আন্দোলন কখন, কিভাবে হইয়াছিল? [৫]

৮। কে, কিভাবে 'আজাদ হিন্দ' ফৌজ গঠন করিলেন? কখন ভারত স্বাধীন হইল? [৫+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

১। "ইংরেজের শাসন.........পরিণত হইল।"

২। "জনগণকে লইয়া........তীরভূমিতে।"

ব্যাকরণগত প্রশ্ন:

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর: রাজদণ্ড, অগ্রগণ্য, অধিবেশন, দীক্ষা, প্রতিরোধ, উদ্দীপ্ত, গৃহকোণে, অর্ধদগ্ধ, অকূল।

২। পদান্তর কর: পরাজিত, নিবেদন, অপমান, গ্রহণ, উদ্দীপ্ত, বিকশিত, দগ্ধ, বিধান, অত্যাচার।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: অত্যাচার, উদ্দীপ্ত, সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতা।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর: — লইয়া কংগ্রেস — অকূল — — ভাসাইয়া ছিল। — এর — ই আগস্ট — সংগ্রামের — আসিয়া ভিড়িল — তীর ভূমিতে।

৫। যে কথাটি ভুল তাহা কাটিয়া দাও:

(ক) ১৮৮০/১৮৭৫/১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়।

(খ) সুভাষচন্দ্রের ফৌজের নাম হইল সুভাষ বিগ্রেড/ভারত ফৌজ/আজাদ হিন্দ ফৌজ/জয়হিন্দ ফৌজ।

(গ) ১৯৪৬/১৯৩৯/১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল।

———

The writer describes briefly the history of India's struggle for independence.



বিদ্রোহী মধুসূদন



বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

পাঠ-প্রস্তুতি : এইবার তোমরা পড়িতে চলিয়াছ একটি নাটকাংশ। নাটক পড়িবার সময় মনে মনে সজীব কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবে। কথায়-চলনে-ভঙ্গিতে মানুষটিকে বুঝিতে চেষ্টা কর। **পূর্ব কথা :** মধুস্থদন দত্তের মনে স্বপ্ন ছিল যে, তিনি ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইবেন। এই আকাঙ্ক্ষার বশে তিনি হঠাৎ খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেন। গীর্জার চারিদিকে পাহারা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করার আয়োজন হয়। মধুস্থদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাঁহাকে ছিনাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাধা দেন মধুস্থদন জননী জহ্নবীদেবী। এইখানে তাঁহার পরের অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

মূলকথা : (রাজনারায়ণ ও জাহ্নবীর অসামান্য প্রতিভাবান একমাত্র পুত্র মাইকেল মধুস্থদন বিদ্রোহী হইয়া, ধর্মত্যাগ করিয়া মাতাপিতাকে কি কঠিন সমস্যায় ফেলিয়াছিলেন এই নাট্যাংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।)

[রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্তমহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—
জাহ্নবী তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন।]

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা ত রেখেছি—লেঠেল শড়কিওয়ালা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি—হ'ল না ত কিছুই! এ কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলাত গিয়ে খৃষ্টান হ'ত তাহলেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হ'ত না— শহরময় এমন টি টি পড়ত না। দ্বারিকা-ঠাকুর, রামমোহন রায়— শহরের দু'জন ভদ্রলোক ত বিলেতে গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড়, আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ। কি করতে বল আমাকে!

[জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।]

হাজার খানেক টাকা দিয়ে তাকে বলে পাঠিয়েছিলাম—যে খৃষ্টান হতে হয় বিলেতে গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও ত সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে? আমি আর কি করব বল? একমাত্র ছেলে হ'লেও খৃষ্টান ছেলে ত আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুস্কিল!—কথা বলছ না কেন—কি করতে বল আমাকে তুমি?

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি, কিন্তু ঘরে নিতে পারি না। মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের কত বড় আঘাত দিয়েছে, তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্তব্য সে ত করেনি।

জাহ্নবী। রাগ কোরোনা—ভেবে দেখ—আমাদের কর্তব্যও আমরা করিনি।

রাজনারায়ণ। করিনি? তার জন্য না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি—তার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করেছি।

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলেছি—মধু যে আজ এমন হয়েছে—তার জন্য আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা, আমি এখন গিয়ে তার পায় ধরে ক্ষমা চাই ?

জাহ্নবী। না, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না—তাকেই তুমি ক্ষমা করো—তার উপর রাগ করে থেকো না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। (উচ্চতর কণ্ঠে) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জলপিণ্ডের একমাত্র আশা! কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে—ধর্মতঃ তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার—কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। (ব্যাকুলভাবে) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ—কোথা পাঠিয়েছ ?

জাহ্নবী। (সভয়ে) মধুকে ডেকে আনতে।

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না—মাপ কর তাকে।

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না। খৃষ্টান হইয়া সে আমার ইহকালের মর্যদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদগতির পথ বন্ধ করেছে! সে আমার পুত্র নয়—শত্রু।

[আবার উপবেশন করিলেন। উভয়েই নীরব।]

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে তুমি? ওকে তুমি ক্ষমা কর।

রাজনারায়ণ। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) ক্ষমা কর মানে? কি করতে হবে আমাকে?

জাহ্নবী। তার উপর রাগ করে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজনারায়ণ। বেশ। তার জন্য কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের তো স্থান নেই। বিশপস্ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে। খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি। (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবেত? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেম—ফেরত দিয়েছে। সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ।

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু করে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়ত হিন্দু হতে পারে—কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; সে অনুরোধ আমায় করো না।

[উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।]

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা, মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথায়?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ভেতরে এলোনা—বলছে, ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর।

জাহ্নবী। যা, তুই ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

[প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরে মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোশাক। মধু আসিয়া জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

জাহ্নবী। মধু—মধু—বাবা আমার!

মধু। মা, রাগ করেছ তুমি? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা, তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়—আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ করো না।

জাহ্নবী। দুঃখ করবো না? তুই বলছিস কি মধু। এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না। আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করবো না? না হয় বিয়ে তুই নাই করতিস্, খৃষ্টান হ'তে গেলি কেন?

মধু। খৃষ্টান হওয়া তো কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হ'তে চাই মা। খৃষ্টান না হ'লে বড় হওয়া যায় না। যীশুখৃষ্ট কত বড় ছিলেন তা যদি জানতে, তাহলে বুঝতে, আমি কোন হীন কাজ করিনি।

জাহ্নবী। আমি বুঝতে চাই না বাবা। আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না। তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে বসে না খাওয়ালে তোর খাওয়া হয় না বাবা! এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই?

[অশ্রুপাত]

মধু। চ্যাপলেনভনের বাড়িতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি?

জাহ্নবী। আজই চ'লে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা—ওরা আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবে বলেছে—ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার।

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। এখানকার লেখাপড়া শেষ করে নে। বিলেত যাবার ব্যবস্থা পরে হবে'খন।

মধু। বিশপস্ কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায়?

জাহ্নবী। পাবি কোথায়! এত দিন যেখনে পেয়েছিস সেখানেই পাবি।

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না।

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি, আত্মহত্যা করব আমি। ছি বাবা, অমন কথা বলতে নেই। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত? কিসের? কোন পাপ তো করিনি!

জাহ্নবী। তা না হলে সমাজ যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে মোটেই আগ্রহ নেই। তা ছাড়া আমি বিলেত যাবই—তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি করে? এ সমাজে তো বিলেত-ফেরতদের স্থান নেই।

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তা হ'লে?

মধু। অসম্ভব—প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? কি এমন পাপ করেছি।

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার—

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বিশপ্‌স্ কলেছে পড়াশুনা করতে রাজী আছি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

[জাহ্নবী নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।]

কেঁদোনা মা, কাঁদছ কেন শুধু শুধু। কেঁদোনা—কেঁদোনা—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর, আমি খারাপ কাজ করিনি। আমি বড় হ'তে চাই—আজকাল খৃষ্টান না হ'লে বড় কিছু হওয়া যায় না। শোন আমার কথা—কেঁদো না—মা—কেঁদো না।

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি ত যায়নি কোথাও, শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা, তুই ফিরে আয়—

[উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

মধু। আমি এখন চললাম—

জাহ্নবী। এখনই? প্রায়শ্চিত্তের তাহলে—

মধু। ও কথা ব'লোনা—তা হলে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।

আলোচনা : নাটকে তিনটি চরিত্র দেখা গেল। মধুসূদন, তাহার মা ও বাবা। সকলেই মধুর খৃষ্টান হওয়া লইয়া চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু লক্ষ্য কর, তিন জনের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। প্রত্যেকের নিজ দৃষ্টিতে খাঁটি। এখানেই নাট্যকারের সার্থকতা।

[দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

বিষয়বিন্যাসী প্রশ্ন :

১। মধুসূদনের পিতা ও মাতার নাম কি? জাহ্নবী রাজনারায়ণের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন কেন? রাজনারায়ণ কি উত্তর দেন? [২+৪+৪]

২। "মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হ'ত না।" —কে, কখন, কাহাকে এই কথাটি বলিলেন? মাথা হেঁট হওয়ার কাজটি কে করিয়াছিলেন? সেই কাজটি কি? এই সম্পর্কে কাহার মানসিকতা কি ছিল। [৩+১+১+৫]

৩। জাহ্নবীর মতে কি প্রকারে মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন? "ধর্মতঃ তার মৃত্যু হয়েছে"—কথাটি কে, কখন বলিলেন? কাহার ধর্মতঃ মৃত্যুর কথা বলা হইতেছে? [৪+৩+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। খৃষ্টান পুত্রকে ফিরাইয়া লইবার জন্য জাহ্নবী কি করিলেন?

২। খৃষ্টান হওয়ার ব্যাপারটি মধুসূদন কিভাবে সমর্থন করিলেন?

৩। মধুসূদন প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলেন না কেন ?

৪। "সে আমি পারব না"—কথাটি কে, কখন, কাহকে বলিলেন ? তিনি কি পারিবেন না ? এই কথা বলিয়া তিনি কি করিলেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

(ক) 'আজকাল খৃষ্টান না হ'লে বড় কিছু হওয়া যায় না।'

(খ) 'যীশুখৃষ্ট কত বড়·········হীন কাজ করিনি।'

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর : অন্তঃপুর, লেঠেল, অর্থব্যয়, উচ্ছৃঙ্খল, অপুত্রক, বিধান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রস্থান, বিদ্রোহী।

২। পদ পরিবর্তন কর : বিসর্জন, প্লাবিত, আঘাত, ব্যয়, নিশ্চয়, উপবেশন, নীরব, পৃথিবী।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : বিশ্বাস — আমি — কাজ —। আমি — হ'তে—। আজকাল — না হ'লে বড় — হওয়া —।

৪। যে কথাটি ভুল তাহা কাটিয়া দাও :

(ক) মধুসূদন মুসলমান/শিখ/খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

(খ) মধুসূদনের মাতার নাম ভাগীরথী/পার্বতী/জাহ্নবী। মধুসূদনের পিতার নাম নরনারায়ণ/কেশবচন্দ্র/রাজনারায়ণ।

(গ) মধুসূদনের মাতা তাঁহার মুসলমান/খৃষ্টান পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে চাহিয়াছিলেন।

(ঘ) জাহ্নবী শ্যামাচরণ/প্যারীমোহন/প্যারীচরণকে পাঠাইলেন তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য।

(ঙ) মধুসূদনের পিতা বলিলেন—"দ্বারিকা ঠাকুর, রবি ঠাকুর, রামমোহন, শহরের দু'জন ভদ্রলোক বিলাতে গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না।"

———

A chapter of Madhusudan's life - Madhusudan has been converted to Christianity. The command of his father or the request of his mother to come back to his own religion can not move him an inch from his stand.

পরিশিষ্ট

শব্দার্থ

পদ্যাংশ

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি/কৃত্তিবাস ওঝা

পথ-পর্যটনে—পথে পথে ভ্রমণে। বামাজাতি—নারীরা। মনঃক্লেশ—মনের দুঃখ। দাসবৎ—ভৃত্যের মত। অভিষেক—রাজসিংহাসনে বা পূজাবেদিতে স্থাপনের অনুষ্ঠান।

বিদ্যা-পরীক্ষা/কাশীরাম দাস

পরীক্ষিতে—পরীক্ষা করতে। ভাসপক্ষী—নকল পাখি। সহোদরে—ভাইকে। বৃকোদর—বুকের ন্যায় উদর যার—এখানে বোঝান হয়েছে। হৃষ্ট—আনন্দিত। স্ফুরিতে—বের হতে। আলিঙ্গিয়া—আলিঙ্গন করে।

ঝড়/ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঘনকুল—মেঘের দল। চপলার—বিদ্যুতের। ঘোরনাদ—তীব্র চিৎকার। নীরদ—মেঘ।

বঙ্গভাষা/মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পরধন—অন্যের ঐশ্বর্য। আচরি—আচরণ করি। পরিহরি—পরিত্যাগ করে। সঁাপ—সঁপিয়া। অবরণ্যে—যাকে বরণ করা উচিত নয়, তাকে। শৈবালে—শেওলায়।

প্রার্থনা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যথিত—দুঃখিত। তরি—পার হই। শকতি—শক্তি। লাঘব—হ্রাস, লঘুতা। নম্র—নত। নিখিল—সমগ্র।

মেথর/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অস্পৃশ্য—ছোঁয়ার অযোগ্য। শুচিতা—পবিত্রতা। শিশুজ্ঞানে—শিশুর মত ভেবে। মানবে—মানুষকে। নির্বিচারে—বিচার-বিবেচনা না করে। অহর্নিশ—দিবারাত্রে। নীলকণ্ঠ—কণ্ঠ নীল যার—শিবকে বোঝান হয়েছে।

অভিযান/নজরুল ইসলাম

মহীয়ান—মহৎ। সমর—যুদ্ধ। আদুল—অনাবৃত। আত্মঘাতী—যে নিজের জীবন হত্যা করে। উত্থান—ওঠা, জাগরণ।

লোহার ব্যথা/যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

স্তব্ধ—কর্মহীন। নেহাই—যার ওপর গরম লোহা রেখে পিটান হয়। বজ্রমুঠি—শক্ত মুঠা। আতপ্ত—গরম। বাহুল্য—বেশি।

উত্থানে/কুমুদরঞ্জন মল্লিক

চতুর্দিকে—চারদিকে। পত্রপুটে—পাতার অঞ্জলিতে।

সবার আমি ছাত্র/সুনির্মল বসু

মৌন—নীরব, কথা না বলে থাকা। মন্ত্রণা—পরামর্শ। মেদুর—স্নিগ্ধ। বনানী—অরণ্য।

মেঘনা/হুমায়ুন কবীর

অথৈ—থৈ পাওয়া যায় না যেখানে, অতল। উছলায়—উছলে ওঠে। দরিয়ায়—নদীতে।

গদ্যাংশ

আমার পিতামহ/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পিতামহ—ঠাকুরদা। সূতিকা গৃহে—আঁতুর ঘরে। অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ। সন্নিহিত—নিকটবর্তী। নিরতিশয়—খুবই। নিস্পৃহ—আগ্রহী নন। পরশ্রীকাতর—অপরের ভাল দেখে যিনি দুঃখ পান। স্পষ্টবাদী—স্পষ্টকথা বলে যে।

বৃষ্টি/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশোষিত—বিশেষভাবে শুষ্ক। ভীমবাদ্য—জোরশব্দ। অট্টালিকা—পাকাবাড়ি। বিশীর্ণা—রোগা। কূলপ্লাবিনী—দুই তীর ভাষায় যা।

নিউটনের কীর্ত্তি/রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অকস্মাৎ—হঠাৎ। বাহাদুরী—কৃতিত্ব। স্বস্থানে—নিজের জায়গায়। বৃক্ষচ্যুত—গাছ থেকে পড়া। রজ্জুবদ্ধ—দড়ি দিয়ে বাঁধা। স্থূলভাবে—সাধারণভাবে।

পালামৌ/সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যাগমন—ফিরে আসা। কুসুমিত—ফুলে ভরা। কদাচারী—খারাপ ব্যবহারকারী। নিরীক্ষণ—দেখা। সমভিব্যাহারে—সঙ্গে। সমাচ্ছাদিত—ঢাকা। তৃণাবৃত—ঘাসে ঢাকা।

বাংলার চাষী গফুর/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দাপট—প্রতাপ, আস্ফালন। দ্বিপ্রহর—দুপুর। অনাবৃষ্টি—খরা, বৃষ্টির অভাব। গোচরটুকু—গরু চরাবার মাঠটুকু। শাকান্ন—শাকভাত। অন্তরীক্ষে—অলক্ষ্যে, আকাশে।

ধাতুর জিনিস/রাজশেখর বসু

কুলগত ব্যবসায়—বংশ পরম্পরায় যে ব্যবসা চলে আসছে। সর্বোত্তম—সবচেয়ে ভাল। নিকৃষ্ট—সবচেয়ে খারাপ। সমকক্ষ—প্রায় সমান। তত্ত্বাবধানে—দেখাশুনায়। নিকটবর্তী—কাছের। উপকণ্ঠে—প্রান্তে, সমীপে, কাছে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ/ডঃ নীরদবরণ হাজরা

নিষ্ঠাবান—দৃঢ় আস্থা আছে যার। ষড়যন্ত্রে—চক্রান্তে। সংস্কৃতজ্ঞ—সংস্কৃত জানা। আত্মবিস্মৃত—নিজেকে ভুলে যাওয়া। অন্তর্যামী—যিনি মনের কথা জানতে পারেন। বৈষয়িক—বিষয় সংক্রান্ত। নির্বিকল্প—বিকল্পহীন, অভ্রান্ত, নিঃসংশয়, পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন। সর্বাগ্রগণ্য—যাকে সবার আগে বিবেচনা বা উল্লেখ করা হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ—খাঁচায় বন্দী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম/সংকলক

আসমুদ্রহিমাচল—সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত। রিক্ত—শূন্য। উৎপীড়ন—অত্যাচার। দাবানল—কাঠে কাঠে ঘষায় জ্বলে ওঠা আগুন। সহায়তা—সাহায্য।

বিদ্রোহী মধুসূদন/বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

অশ্রুপ্লাবিত—চোখের জলে ভেজা, কান্না ভেজা। জলপিণ্ড—শ্রাদ্ধের তর্পণাদি। মুখদর্শন—মুখ না দেখা। প্রায়শ্চিত্ত—পাপস্খালনের জন্য অনুষ্ঠান।

॥ কবি পরিচিতি ॥

কৃত্তিবাস ওঝা : চতুর্দশ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বাঙলাভাষার প্রথম কবি। তাঁর রামায়ণ ছিল বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ। ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারীরা প্রথম এ গ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করেন।

কাশীরাম দাস : ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। তিনি 'ভারত-পাঁচালী' কাব্যের কবি। এই ভারত-পাঁচালী আসলে মহাভারতের বাঙলা-সংস্করণ। কাশীরাম সম্পূর্ণ অনুবাদ করবার আগেই মারা যান। তবে সমগ্র অনুবাদই তাঁর নামে চলে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : কাঁচড়াপাড়ার কাছে শিয়ালডাঙ্গায় জন্ম। পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন কিন্তু মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে জানতেন। ব্যাঙ্গাত্মক করিতা রচনায় খ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি এক বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। নাম : সংবাদ প্রভাকর। ১৮৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের) সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। এ ছাড়া মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ইত্যাদি রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ কবি হলেও গল্প, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই অতুলনীয় সাহিত্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : এই গ্রন্থে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুন মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত ১৫ খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র ও আবীর', 'তীর্থসলিল', 'হোমশিখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নজরুল ইসলাম : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিদ্রোহী কবিতা এক সময় বাঙালীকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্যোগী কর্মী ছিলেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে কবি হঠাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যান। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যান এবং সেখানেই ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাঙলাভাষায় কাব্য রচনা করে যাঁরা খ্যাত যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র সহানুভূতি আর তারই ফলে ভ্রষ্ট সভ্য সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ কবির প্রধান সুর। ১৮৮৭ সালের বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে কবির জন্ম হয়। ১৯৫৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কবির মৃত্যু হয়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক : ১৮৮২ সালের ৩রা মার্চ কবির জন্ম হয় বর্ধমানের কো গ্রামে। ১৯০৫ সালে বি. এ. পাশ করে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক' পান। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। তিনি ১৯৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মারা যান।

সুনির্মল বসু : ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটদের জন্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ূন কবীর : ১৯০৬ সালে ফরিদপুরে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। রাজনীতিতেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ লেখক পরিচিতি ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ জন্ম ১৮২০ সাল; মৃত্যু ১৮৯১। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম হয়। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয়েও নিজশ্রমে বঙ্গদেশ তথা ভারতখ্যাত পণ্ডিতে পরিণত হন। সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁর পাণ্ডিত্যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন শিক্ষাব্রতী অন্যদিকে সমাজসংস্কারক। তিনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার বিষয়ে জীবনপাত করেন। প্রয়োজনের অনুবন্ধে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। 'বর্ণপরিচয়,' 'কথামালা', 'সীতার বনবাস' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৮৩৪—মৃত্যু ১৮৮৯। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর 'মাধবীলতা', 'কণ্ঠমালা' 'পালামৌ' ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৮৩৮—মৃত্যু ১৮৯৪। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেকটর। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 'বি. এ.' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ ইত্যাদি প্রধান।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ জন্ম ১৮৬৪—মৃত্যু ১৯১৯। রামেন্দ্রসুন্দরের পৈত্রিক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়। তিনি কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকতাও করেন। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'চরিতকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৮৭৬—মৃত্যু ১৯৩৮। হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর রচনা সমাজের কুসংস্কার, ধর্মের ও আচারের সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত বিখ্যাত।

রাজশেখর বসু ॥ জন্ম ১৮৮৮—মৃত্যু ১৯৬০। রাজশেখর বসু ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রাম। ইনি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে পরিচিত। 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারিতে বলাইচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাগলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। 'বনফুল' ছদ্ম নামে বহু কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাত হন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটকও আছে।